২

আর্য সমাজ ও সভ্যতা

এক সময় ধারণা করা হতো যে আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে ঐতিহাসিক যুগের শুরু আর্যদের আগমন থেকেই। আর্যদের আদি বাসস্থান ও ভারতবর্ষে আগমন এবং ক্রমবিস্তারে বর্ণনা রয়েছে প্রথম পাঠে।
ঋগ্-বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যসমাজের ইতিহাস স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় পাঠে। আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন ও ধর্মবিশ্বাস আলোচনা করে আর্য সভ্যতার পরিচয় দান করা হয়েছে।
আর্য সমাজে 'ধর্ম' ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতে জন্ম নিয়েছে দুটি নতুন ধর্মমত– জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। এই ধর্মদ্বয়ের উদ্ভব ও মূলমন্ত্র আলোচিত হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- **পাঠ-২. আর্যদের আগমন ও বিস্তার**
- **পাঠ-২. আর্যদের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবন**
- **পাঠ-৩. জৈন ধর্ম**
- **পাঠ-৪. বৌদ্ধ ধর্ম।**

পাঠ - ১

আর্যদের আগমন ও বিস্তার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি

- আর্যদের আদি বাসভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ জানতে পারবেন।
- ভারতবর্ষে আর্যদের বসতি বিস্তারের বিবরণ দিতে পারবেন।

সংস্কৃতে আর্য শব্দের অর্থ সৎবংশজাত ব্যক্তি। ম্যাক্সমুলার, স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি পন্ডিতের মতে আর্য একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। যারা আর্য ভাষায় কথা বলে তারাই আর্য জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত।

ফিলিপ্পো স্যাসেটি নামক ফ্লোরেন্সের একজন বণিক গোয়াতে পাঁচবছর অবস্থানের (১৭৮৩-১৭৮৮ খ্রিঃ) পর প্রথম সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপের প্রধান কয়েকটি ভাষার সাদৃশ্যের কথা ঘোষণা করেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, একই উৎস থেকে উৎপত্তির কারণে এ সাদৃশ্য। তাঁর মতে, গ্রিক, ল্যাটিন, গথিক, কেল্টিক, সংস্কৃত, পারসিক, জার্মান ইত্যাদি একই উৎস থেকে উদ্ভুত। এ ভাষাগুলো পন্ডিতদের কাছে ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-জার্মান ভাষা রূপে পরিচিত। ভাষাগত সাদৃশ্যের কারণে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে যে, এই আর্য ভাষা যে জাতিগোষ্ঠী ব্যবহার করতো তাদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল।এ সম্পর্কে পন্ডিতগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। একদল পন্ডিত মনে করেন যে, আর্যরা আদিতে ভারতবাসী ছিল। পরবর্তীকালে তারা ভারতের বাইরে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদের মতে, আর্যরা বাইরে থেকে এসে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

যাঁরা মনে করেন যে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতবর্ষ, তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন :

(ক) আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ ভারতে রচিত হয়েছিল। বেদে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে যে সকল গাছ ও পশু-পাখির উল্লেখ আছে তা ভারতের এই অঞ্চলে দেখা যায়।

(খ) যারা দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করে তারা তাদের আদি বাসভূমির কথা স্মরণ করে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে সপ্তসিন্ধু ছাড়া অন্য কোন দেশের নাম পাওয়া যায় না।

(গ) পারগিটারের মতে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্যদের অভিপ্রয়াণের কোন প্রমাণ ভারতের ইতিহাসে নেই, বরং উত্তর-পশ্চিম হতে আর্যদের ভারতের বাইরে যাওয়া সম্ভব। ঋগ্বেদের নদী স্তোত্রে যে নদীগুলোর উল্লেখ আছে তা গঙ্গা দিয়ে শুরু হয়ে উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী দিয়ে শেষ হয়েছে। এই নদী স্তোত্র থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে আর্যরা পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে গিয়েছিল।

(ঘ) আর্যরা বহিরাগত হলে তাদের আদি বাসভূমিতে বেদের মত কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি কেন?

এসব যুক্তির মাধ্যমে কিছু ঐতিহাসিক দাবী করেন যে, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতবর্ষ। কিন্তু কোনো কোনো পন্ডিত এ মতের বিপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) বেদে উল্লেখিত গাছপালা ও পশুপাখির নাম থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে তারা ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করায় ঐ এলাকার গাছপালা ও পশুপাখির সঙ্গে তাদের প্রথম পরিচয় ঘটে। এ কারণেই এগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বেদও রচিত হয়েছিল ঐ এলাকাতেই।

(খ) এমনও হতে পারে যে দীর্ঘকাল সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বাস করার ফলে আর্যরা তাদের আদি বাসভূমির সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিল বলেই বেদে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(গ) নদী স্তোত্র দিয়ে আর্যদের উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বাইরে অভিপ্রয়াণ প্রমাণ করা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে ৩৯ টি নদীর নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে ঋগ্বেদেই পাওয়া যায় ২৫টি নদীর নাম, কিন্তু গঙ্গা নদীর নাম শুধুমাত্র একবার উল্লেখিত হয়েছে। আর্যরা ভারতের আদিবাসী হলে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে অভিপ্রয়াণ ঘটে থাকলে গঙ্গা নদীর সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কথা এবং সে ক্ষেত্রে গঙ্গার নাম বারবার উল্লেখিত হওয়া উচিৎ ছিল।

(ঘ) ঋগ্বেদের মত কোন গ্রন্থ অন্য কোন দেশে রচিত হয়নি বলেই বলা যায় না যে ভারতই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। এমনও হতে পারে যে ভারতে আসার আগে বেদের মত গ্রন্থ রচনা করার মত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক উন্নয়ন তাদের ঘটেনি।

(ঙ) তাছাড়া বলা যায় যে ভারতবর্ষ আর্যদের আদি বাসভূমি হলে তারা ভারত ত্যাগের আগেই গোটা ভারতবর্ষে আর্য বসতি ও সংস্কৃতি বিস্তার করতো। কিন্তু উত্তর ভারতের বেশ কিছু এলাকা এবং দক্ষিণ ভারত ছিল আর্য সংস্কৃতির বাইরে।

(চ) সংস্কৃত ভাষায় তালব্য বর্ণের (ন, ং, ৎ) প্রাধান্য দেখা যায় যা ইউরোপীয় অন্য কোন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় নেই। পন্ডিতেরা মনে করেন যে, ইউরোপ থেকে ভারতে আসার পর দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবে এরকম হয়েছে।

(ছ) বৈদিক সাহিত্যে সিংহের উল্লেখ থাকলেও বাঘ ও হাতির উল্লেখ নেই। আর্যরা ভারতের আদিবাসী হলে ভারতের এই দুটি প্রাণীর নামের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে অবশ্যই থাকা উচিৎ ছিল।

এসব যুক্তির বলে পন্ডিতেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতের বাইরে।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আর্যরা ইউরোপ থেকে ভারতে এসেছিল। তাঁদের যুক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সাতটি ভাষার মধ্যে পাঁচটি এখনও ইউরোপের ভাষা, শুধু সংস্কৃত ও পারসিক ইউরোপের বাইরের।ইউরোপে গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি আর্য ভাষাগুলোর যে রকম ঘন সন্নিবেশ দেখা যায় ভারতে তা দেখা যায় না। ইউরোপে আর্য গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার আধিক্যের কারণে পন্ডিতেরা মনে করেন যে, আদিতে আর্যরা ইউরোপেই বাস করতো।

(খ) বৈদিক সাহিত্যে ওক, উইলো, বার্চ ইত্যাদি গাছ এবং ঘোড়া, গাভী, ষাঁড়, শুকর প্রভৃতি জন্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচ্য দেশের জন্তু হাতি, বাঘ, উট ইত্যাদির কোনো উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নেই।

(গ) অধ্যাপক গাইলস মনে করেন যে, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সমুদ্রের কোন উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যায় যে আর্যদের আদি বাসভূমি কোন দ্বীপে বা সমুদ্র তীরে ছিলনা। তারা যেসব গাছপালা ও পশুপাখির নাম উল্লেখ করেছে সেগুলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের।আর্যরা তখন স্থায়ীভাবে বসবাস এবং কৃষিকাজ শুরু করেছিল। তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া ও ভেড়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন ছিল। তাহলে মনে করতে হবে যে আর্যদের আদি বাসস্থান এমন একটি স্থানে ছিল যেখানে কৃষি ও চারণযোগ্য পরিবেশ কোনটিরই অভাব ছিলনা । সেখানে কৃষিযোগ্য জমি, ঘোড়ার জন্য বিস্তীর্ণ স্তেপ এবং ভেড়া চরানোর জন্য উঁচু জমি– সবই ছিল। এসবের দিকে লক্ষ রেখে ড. গাইলস বর্তমান অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি অঞ্চলকেই আর্যদের আদি বাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

অধ্যাপক ব্র্যান্ডেস্টাইন মনে করেন যে, উরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরঘিজ স্তেপ অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি শব্দতত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রথম দিকের ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলীতে কোন পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ স্তেপ ভূমিতে আর্যদের আদি বাসভূমির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জমি, গাছপালা এবং জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে শুষ্ক স্তেপভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শব্দাবলীর পরিবর্তে জলাভূমির স্পষ্ট

ইঙ্গিতবাহী শব্দাবলী পাওয়া যায়। বর্তমানে অধিকাংশ পন্ডিতই ব্র্যান্ডেস্টাইনের মতের সমর্থক এবং তাঁরা মনে করেন যে, কিরঘিজ অঞ্চলই আর্যদের আদি বাসভূমি।

বেদ হচ্ছে আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। বেদ প্রথমে লিখিত আকারে ছিলনা। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলো প্রথম রচিত হয় এবং শ্রুতি বা কানে শুনে স্মৃতি বা আবৃত্তির মাধ্যমে বহুকাল বংশ পরম্পরায় থেকে যায়। অনেক পরে বেদকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ঋগ্বেদের রচনাকাল জানতে পারলে আর্যদের ভারতে আগমনের সময় জানা যায়।জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে, ঋগ্বেদ কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে রচিত হয়নি। ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় রচিত হয়েছিল। তাঁর মতে, ঋগ্বেদের রচনাকাল ছিল ১২০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। উইন্টারনিৎস ঋগ্বেদ ও প্রাচীন পারসিক ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তার ভাষার অসাধারণ সাদৃশ্য দেখে মনে করেন যে, দুটি গ্রন্থই সমসাময়িককালে রচিত হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিতদের মতে আবেস্তা রচিত হয়েছিল আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কাজেই ঋগ্বেদের রচনার সময়কালও অনুরূপ হতে পারে।

এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত বোঘাজকোই নামক স্থানে খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রমুখের অনুরূপ নাম আছে। এ থেকে মনে করা যায় যে ঋগ্বেদের রচনা শুরু হয়েছিল ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে। অধ্যাপক ব্যাশাম মনে করেন যে, ঋগ্বেদের রচনা কাল ছিল ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সাধারণত পন্ডিতগণ মনে করেন যে, আর্যরা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

ঋগ্বেদ থেকে আর্যদের ভারতে বসতি স্থাপন ও বিস্তার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এ সম্পর্কে আরো কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদে আফগানিস্তানের কাবুল ও স্বাত, পাঞ্জাবের শতদ্রু ,ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, ঝিলাম এবং সিন্ধু ও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে এবং প্রথমে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। আর্যরা আফগানিস্তান সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 'সপ্তসিন্ধু' আখ্যা দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদের প্রথম দিকের স্তোত্রগুলোতে ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা বা যমুনার কোন উল্লেখ নেই। অধ্যাপক রোমিলা থাপার মনে করেন যে, ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা দিল্লি অঞ্চল পর্যন্ত বসতি বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে আর্যরা আরো পূর্বদিকে তাদের বসতি বিস্তার করে। পরবর্তী বৈদিক উৎসগুলোতে দুটি সাগর এবং হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। গাঙ্গেয় উপত্যকার আবহাওয়া তখন ছিল আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল। ফলে পাথর, ব্রোঞ্জ ও তামার হাতিয়ার দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে খুব দ্রুত পূর্বদিকে বসতি স্থাপন সম্ভব ছিলনা। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে লোহার প্রচলন ঘটলে আর্যরা দ্রুত বসতি বিস্তার করতে সক্ষম হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে গোচারণ ভূমি, বনজ সম্পদ এবং কৃষি ক্ষেত্রের ওপর চাপ পরে। পূর্ব ভারতের গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ। এসব সম্পদের লোভে এবং পাঞ্জাবে স্থানাভাবের কারণে আর্যরা পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্র পাঞ্জাব থেকে মধ্যদেশ বা গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় সরে আসে। দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তার সম্পর্কে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করেনি।

সারসংক্ষেপ

আর্যদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে পন্ডিতগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে বর্তমানে অধ্যাপক ব্র্যান্ডেস্টাইনের মতানুসারে অধিকাংশ পন্ডিতই মনে করেন যে, ওরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরঘিজ স্তেপ অঞ্চলই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি।বেদ হচ্ছে আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য, যা প্রথমে লিখিত আকারে ছিল না। অনেক পরে বেদ লিপিবদ্ধ করা হয়। চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ঋগ্বেদ। আর্যদের ভারতে বসতি স্থাপন ও বিস্তার সম্পর্কে ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত পন্ডিতগণ মনে করেন আর্যরা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে প্রথমে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তারা 'সপ্তসিন্ধু' নামে আখ্যা দিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের বসতি বিস্তার করে। দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার সম্পর্কে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক প্রশ্নের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আর্যদের আদিবাসভূমি ছিল -

(ক) সাইবেরিয়া (খ) ভারতবর্ষ

(গ) কিরঘিজ অঞ্চল (ঘ) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি

২. আর্যরা ভারতে প্রথম আসে -

(ক) খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে (খ) খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে

(গ) খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে (ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে

৩. আর্যরা প্রথমে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল -

(ক) বেলুচিস্তানে (খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও পাঞ্জাবে

(গ) দক্ষিণ ভারতে (ঘ) বাংলায়

৪. পরবর্তীকালে ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার ঘটেছিল -

(ক) রাজপুতনায় (খ) কাশ্মিরে

(গ) গাঙ্গেয় উপত্যকায় (ঘ) সৌরাষ্ট্রে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আর্যরা কি ইউরোপ থেকে আগত?

২। ঋগ্বেদে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ও বসতি বিস্তারের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. আর্যদের আদি বাসভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করুন ।

২. ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ও বসতি বিস্তারের বিবরণ দিন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People* (Vol-1), *Vedic Age.*

২। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ২

আর্যদের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি

- আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন ;
- পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের জীবনচর্চায় পরিবর্তনসমূহের বিবরণ আপনি দিতে পারবেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল বলে মনে করা হয়। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে ভারতে তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায়। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। এটা আবার চার ভাগে বিভক্ত যথা ঃ ঋক্, সাম, যজুর এবং অথর্ব। ঋগ্বেদের সম্ভাব্য রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৯০০ অব্দের মধ্যে বলে অধ্যাপক ব্যাশাম মনে করেন। অন্য তিনটি বেদ খ্রিস্টপূর্ব ৯০০-৬০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আর্য সভ্যতাকে দুই ভাগে আলোচনা করা যায়- ঋগ্বেদের যুগের সভ্যতা বা ঋগ্বৈদিক সভ্যতা এবং পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা।

ঋগ্বৈদিক আর্য সভ্যতা

সামাজিক অবস্থা ঃ

ঋগ্বেদে একটি সুসংগঠিত সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।এক বিবাহ প্রচলিত নিয়ম হলেও রাজপরিবারের বা খুব উচ্চবিত্ত পরিবারে মাঝে মাঝে বহু বিবাহ দেখা যায়। বহু পতিত্ব অবশ্য প্রচলিত ছিল না। বিবাহকে পবিত্র বন্ধনরূপে বিবেচনা করা হতো এবং বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত ছিলনা।বিধবাদের সাধারণত: সন্তানহীনাদের দেবরের সঙ্গে পুন:বিবাহের নিয়ম ছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সন্তানের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই মনে হয় এটা হয়েছিল।পণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে মাঝে মাঝে বরকেই পণ দিতে হতো। মেয়েদের জন্য বিয়ে বাধ্যতামূলক ছিল না এবং দেখা যায় যে মেয়ে বাবা বা ভাইয়ের সংসারে থেকে যেতো। বিয়ের পর নববধূ তার নতুন সংসারে সম্মানজনক স্থান লাভ করতো এবং শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, ভাসুর, দেবর এবং ননদদের দেখাশুনা করতো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতো এবং স্ত্রীর অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন অনুষ্ঠানকেই কার্যকর বিবেচনা করা হতো না। বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে কনের পিতার পছন্দের মূল্য দেওয়া হতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কনেরও কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং শিক্ষিতা মহিলা হিসাবে আমরা লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, মমতা, ঘোষা প্রমুখের নাম দেখতে পাই এবং তাঁরা বেদমন্ত্রও রচনা করেছিলেন। মহিলারা যুদ্ধবিদ্যা, অসিচালনা ইত্যাদিও শিখতেন। পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিলনা। সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া গেলেও বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকায় অধ্যাপক রোমিলা থাপার মনে করেন যে, ঋগ্বৈদিক যুগে সতীদাহ ছিল প্রতীকি।

পরিবার ছিল পিতৃ-প্রধান। পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়স্ক পুরুষ গৃহপতি হিসাবে গণ্য হতেন। তিনি ছিলেন সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির মালিক। গরু, ঘোড়া, অলঙ্কার ইত্যাদির মত অস্থাবর সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অন্যদের থাকতে পারতো।দত্তক-সন্তান নেওয়ার অধিকার স্বীকৃত ছিল।পুত্রহীন পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে কন্যা নয়, লাভ করতো দৌহিত্র।পরিবার ছিল একান্নবর্তী এবং পিতা-মাতা, পিতামহী, মাতামহী এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে পরিবার গঠিত হতো।পরিবারের প্রধানকে বলা হতো কুলপ বা দম্পতি।

পরিবার পিতৃ-প্রধান হওয়ায় সকলেই পুত্র সন্তান কামনা করতো, তবে কন্যা সন্তানকে অবহেলা করা হতো না।

যব, গম, দুধ, ফলমূল, মাছ ও মাংস ছিল আর্যদের প্রধান খাদ্য। তারা ভাত ও চাল-জাত খাদ্যও খেতো। ঘি, মাখন, দই ইত্যাদি তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তারা পিঠা ও চালজাত পায়েশও খেতো। ঘোড়া, ছাগল ও পাখির মাংস ছিল তাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। গরুর মাংসও তারা খেতো, তবে ঋগ্বেদে দুগ্ধবতী গাভী হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদে আর্যদের আহার্যের তালিকায় লবণের কোন উল্লেখ নেই। নদী,ঝর্ণা, কূপ থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা হতো। তাছাড়া আর্যরা সোম ও সুরা নামক দুটি উত্তেজক পানীয়ও পান করতো। সুরা ছিল সাধারণ উত্তেজক পানীয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে সোম রস পান করা হতো। এটা ছিল এক ধরনের লতার রস।

এ যুগে আর্যদের পোশাক তিন অংশে বিভক্ত ছিল - নীবি, বাস বা পরিধান এবং অধিবাস বা দ্রাপি। নীবি ছিল অন্তর্বাস, বাস ছিল বাইরের বা ওপরের পোশাক এবং অধিবাস ছিল উত্তরীয় বা চাদর। এসব পোশাক সুতি ও পশমি হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চামড়া, বিশেষত হরিণের চামড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করা হতো। ধনীদের পোশাক সোনার সুতা দিয়ে কারুকাজ করা থাকতো। নারী ও পুরুষ সবাই সোনার ও ফুলের অলঙ্কার ব্যবহার করতো। মেয়েরা বেনী বাঁধতো। নারী পুরুষ উভয়েই হার, দুল, বালা ইত্যাদি অলঙ্কার পরতো। পুরুষদের মধ্যে দাড়ি রাখা ও দাড়ি কাটা উভয় রেওয়াজই ছিল।

ঋগ্বৈদিক যুগে আর্যদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিরানন্দ ছিল না। অবসর বিনোদনের জন্য ছিল সঙ্গীত, নাচ, জুয়াখেলা, রথ-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। ঋগ্বেদে ঢোল, বীণা, বাঁশি, করতাল ইত্যাদির মতো বেশ কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। সঙ্গীতের তাল-লয়-গ্রাম সর্ম্পকেও তাদের জ্ঞান ছিল। ঋগ্বেদে জুয়াখেলার বিভিন্ন ধরণ, উপকরণ ও নিয়মকানুনের বর্ণনা আছে। রথের দৌড় ছিল উচ্চবিত্তের খেলা। সাধারণত: দুটো ঘোড়া রথ টানতো এবং রথে দুজন বসতে পারতো।

ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের বাসগৃহ ছিল কাঠের খুঁটির ওপর খড়ের চাল দিয়ে তৈরি। এগুলো ছিল আয়তাকার ও একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট। বাসগৃহের এক অংশে ছিল গৃহপালিত পশুপাখিদের থাকার স্থান। প্রত্যেক বাড়িতেই একটি ছোট অগ্নিকুন্ড সবসময় জ্বালিয়ে রাখা হতো।

আর্যসভ্যতার আগেই সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বর্ণমালা ব্যবহার করলেও শুরুতে আর্যরা লিখতে জানত না। অধ্যাপক রোমিলা থাপার মনে করেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দের দিকে আর্যদের মধ্যে বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঋগ্বেদের যুগে পাঠ দান ছিল মৌখিক। গুরুর উচ্চারিত পাঠ ছাত্ররা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বারবার আবৃত্তি করে মুখস্থ করে নিত। শিক্ষা ছিল উচ্চবর্ণের মধ্যে এবং বেদ পাঠ ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত। অঙ্ক, ব্যাকরণ ও ছন্দবিজ্ঞান ছিল পাঠ্যসূচির অন্তর্গত প্রধান বিষয়।

আদিতে আর্যদের মধ্যে কোন জাতিভেদ ছিলনা। আর্যদের সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের গায়ের বর্ণের ভিন্নতার কারণে বর্ণভেদ ছিল। আর্যরা ছিল ফর্সা, দীর্ঘকায় ও উন্নত নাসিকাযুক্ত দেখতে সুন্দর। ভারতের আদিম অধিবাসীরা ছিল কৃষ্ণকায়। ফলে আর্য ও অনার্য এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজ জীবনের জটিলতার কারণে কর্মক্ষমতা এবং পেশার ভিত্তিতে সমাজ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূজা-পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ ও শাস্ত্রপাঠে পারদর্শীরা 'ব্রাহ্মণ' ও দেশরক্ষা ও দেশ শাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা 'ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও পশুপালনে নিয়োজিতরা হলেন 'বৈশ্য'। এ তিন শ্রেণীর সেবাকাজে নিয়োজিতরা 'শূদ্র' নামে পরিচিত হয়। এ শ্রেণীবিভাগ বংশানুক্রমিক ছিলনা। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ ও একসঙ্গে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না। পরবর্তীকালে আর্যসমাজে জাতিভেদের যে কঠোরতা দেখা যায় ঋগ্বৈদিক যুগে তা ছিল না। ইচ্ছা ও সুযোগমত তাঁরা পেশা পরিবর্তন করতে পারতো। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। অগ্যস্ত্য ঋষি বিয়ে করেছিলেন বিদর্ভরাজের কন্যা লোপামুদ্রাকে। ঋষিকন্যা দেবযানির বিয়ে হয়েছিল ক্ষত্রিয় এক রাজার সঙ্গে। শূদ্রের হাতের রান্না খাওয়া কারো জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। নিম্নবর্ণের কারো স্পর্শ অন্য কাউকে অপবিত্র করে এরকম ধারণাও

তখন জন্মলাভ করেনি। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ছিল। অনার্যরা দাস, দস্যু বা অসুর নামে অভিহিত হতো। অনার্যদের ভাষা ছিল আলাদা এবং তাঁরা আর্যদের মত দেব-দেবীর পূজা বা পশুবলিও করতো না। যুদ্ধক্ষেত্রে আর্যরা অনার্যদের ভয় পেত। অধ্যাপক রোমিলা থাপারের মতে, অনার্যদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাদের স্বকীয়তা বিলোপ পেতে পারে এ ভয়ও আর্যদের অনার্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের জীবন চারটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল যা চতুরাশ্রম নামে পরিচিত। সমাজের প্রথম তিন শ্রেণীর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য ছিল। বাল্যে ও কৈশোরে আর্যসন্তান গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যাচর্চা করতো এবং গুরুর সংসারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতো। এটাকে বলা হতো ব্রহ্মচর্য। সাহিত্য, ব্যাকরণ, ছন্দ ও বেদ ছিল গুরুগৃহে শিক্ষার বিষয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যৌবনে বিয়ে করে সে সংসারী হতো এবং এ পর্যায়কে বলা হয় গার্হস্থ্য।প্রৌঢ় অবস্থায় সংসার, সম্পত্তি, পরিজন ইত্যাদির মায়া ত্যাগ করে পরলোকের চিন্তা ও অরণ্যবাস ছিল বাণপ্রস্থ পর্যায়। সবশেষে ছিল সন্ন্যাস পর্যায়। এ পর্যায়ে ঈশ্বর চিন্তা ও সন্ন্যাস জীবন যাপন করে গৃহত্যাগী হয়ে ভ্রমণ করা ছিল সন্ন্যাসীর কর্তব্য।

অর্থনৈতিক অবস্থা

ঋগ্বেদের যুগে আর্যরা গ্রামে বাস করতো। ঋগ্বেদে 'পুর' (দুর্গ বা প্রাকার অর্থে ব্যবহৃত) এর উল্লেখ থাকলেও নগর বা শহরের কোন উল্লেখ নেই। ঋগ্বৈদিক সভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। সে যুগে আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষি ও পশুপালন। গরু দিয়ে লাঙল টানা হতো। লাঙলকে বলা হয় 'শীর'। চাষের জমিকে বলা হতো 'ক্ষেত্র' বা 'উর্বরা'। ছয়, আট বা বারটি গরু লাঙল টানত। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। এ জন্য 'জলচক্র' ও জলাশয় ব্যবহার করা হত। ঋগ্বেদে জমি চাষ, বীজবপন, ফসলকাটা, গোলাজাত করা ও ফসল মাড়াই করার উল্লেখ আছে। ফসল কাটা হতো কাঁচি দিয়ে। আর্যরা যব, গম, ধান, বার্লি ইত্যাদি শস্যের চাষ করতো। ঋগ্বেদে ধান বা গমের উল্লেখ নেই। তবে অধ্যাপক ব্যাশাম মনে করেন যে, সম্ভবত ঋগ্বেদে সাধারণ খাদ্যশস্য অর্থে যব শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা দিয়ে গম এবং ধানকেও বোঝানো হয়েছে। পাখি, পঙ্গপাল, অতিবৃষ্টি বা খরাতে শস্যহানির কথাও ঋগ্বেদে আছে।

ঋগ্বেদের যুগে জমির মালিকানা ব্যবস্থা সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. এইচ.সি.রায় চৌধুরীর মতে, পশুচারণ ভূমি ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি। বাস্তু ও আবাদী জমি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। অধ্যাপক রোমিলা থাপার মনে করেন যে, গোড়াতে জমি ছিল গ্রামের মালিকানাধীন। কিন্তু পরে উপজাতিক সংস্থাগুলো ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ায় পরিবারগুলোর মধ্যে জমি ভাগ করা দেওয়া হয় এবং জমির ব্যক্তিমালিকানা সৃস্টি হয়।

অধ্যাপক রোমিলা থাপারের মতে, গোড়াতে ভারতীয় আর্যরা ছিল পশুপালক, পরে তাঁরা কৃষিকাজে মনোনিবেশ করে। যাই হোক, কৃষির পরেই পশুপালন ছিল প্রধান জীবিকা। গরু ছিল প্রধান গৃহপালিত পশু এবং গরুকে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হতো। যমুনা নদীর উপত্যকা গো-সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। গরু যাতে হারিয়ে না যায় এজন্য গরুগুলোর কানে নানা রকম সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া থাকত। সাধারণ মানুষ গো-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতো। পুরোহিতদের গো-দানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হতো। ঋগ্বেদে 'গাভিষ্টি' শব্দটি পাওয়া যায় যার অর্থ গো-অনুসন্ধান। তবে এ দিয়ে যুদ্ধকে বোঝানো হত যা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে গরু লুন্ঠন এবং হারানো গরুকে কেন্দ্র করে উপজাতিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেতো। গরুর মাংস খাওয়া হতো। দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ছিল আর্যদের প্রিয় খাদ্য। চামড়া দিয়ে পাথর ছোঁড়ার জন্য গুলতি, ধনুকের জ্যা, রথের দড়ি, লাগাম, চাবুক ইত্যাদি তৈরি হত। মূল্যের একক ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গরুকে ব্যবহার করা হতো। ব্যক্তিবিশেষের সম্পদও নিরূপিত হত গরু দিয়ে। ঘোড়া যুদ্ধে ও রথ টানার কাজে ব্যবহার হতো বলে ঘোড়াও ছিল মূল্যবান গৃহপালিত পশু। পশমের উৎস হিসাবে ভেড়াও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানত কৃষি ও পশুপালন এ যুগের অর্থনৈতিক ভিত্তি হলেও আর্যরা বিভিন্ন শিল্পকর্মেও পটু ছিল। শিল্পের মধ্যে মৃতশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, কারুশিল্প ছিল উল্লেখযোগ্য। এযুগে সূত্রধর বা কাঠের মিস্ত্রির কাজ বেশ লাভজনক ছিল। রথ, লাঙল, গৃহ, গরুর গাড়ী ইত্যাদি সে তৈরি করতো। চর্মকার পশুর চামড়া দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতো। কামার বিভিন্ন ধাতু দিয়ে সংসারের ও যুদ্ধের জিনিসপত্র তৈরি করতো। এ যুগে ব্রোঞ্জ ও তামার প্রচলন ছিল বেশি। অধ্যাপক ব্যাশামের মতে এ যুগে লোহার ব্যবহার ছিলনা । সাধারণত মহিলারা বয়নশিল্পের কাজ করতো।

শিকার ছিল পেশা এবং নেশা - উভয়ই। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে গৃহপালিত পশুগুলোকে এবং পাখির হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য শিকার ছিল আবশ্যকীয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকম পশুপাখি শিকার করা হতো।

আর্যরা বিভিন্ন শিল্পকর্মেও পটু ছিল।পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভূমি আবাদের ফলে নদী হয়ে ওঠে বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রধান জলপথ। নদীর তীরবর্তী বসতিগুলো বাজারে পরিণত হয়। জমির অপেক্ষাকৃত ধনী মালিকরা তাদের জমি চাষের জন্য অন্যদের নিযুক্ত করে এবং নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যবসায়ের কাজে লাগায়। এ ভাবেই ভূ-স্বামী শ্রেণী থেকে বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। প্রধানত স্থানীয়ভাবে বাণিজ্য চলত। ঋগ্বেদে জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ থাকলেও মনে হয় শুধু মাত্র উপকূলীয় এলাকাতেই সমুদ্র বাণিজ্য সীমিত ছিল। 'নিষ্ক' নামক স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকলেও তা দিয়ে বহির্বাণিজ্য কতটুকু চালানো যেতো সে সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অধ্যাপক ব্যাশাম বলেছেন যে, মুদ্রা হিসাবে নিষ্কের উল্লেখ থাকলেও সে আমলে নিষ্ক ছিল এক ধরনের অলঙ্কার। দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেই প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। বড় বড় লেনদেনে গাভীকে মূল্যের একক হিসেবে ধরা হতো।বাজারে দর কষাকষির রীতি ছিল, তবে স্বীকৃত চুক্তি মেনে চলতে হতো এবং বিক্রিত দ্রব্যসামগ্রী ফেরৎ নেওয়া হতো না। সে যুগেও সুদ প্রথা প্রচলিত ছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ ও জলপথ দুটোই ব্যবহার করা হতো। স্থলপথে রথ ও গরুর গাড়ী এবং জলপথে নৌকায় মাল চলাচল করতো। এই যুগে সমুদ্র বাণিজ্য সর্ম্পকে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। ঋগ্বেদে 'মনা' নামক মুদ্রার উল্লেখ থেকে অনেকে মনে করেন যে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে আর্যদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, কারণ মনা ছিল ব্যাবিলনের মুদ্রা। ঋগ্বেদে শতদাঁড় বিশিষ্ট 'শত অনিত্র' নামের নৌকার উল্লেখ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে এগুলো ছিল সমুদ্রগামী নৌকা। তবে ঋগ্বেদে সিন্ধু নদীর মোহনার অনুল্লেখ ও মুদ্রা অর্থনীতির অনুপস্থিতি সমুদ্র বাণিজ্যের বিরোধিতা করে।

ধর্মীয় অবস্থা

ঋগ্বৈদিক আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ সরল। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে পূজা করতো। তারা স্বর্গের, বায়ুমন্ডলের এবং পৃথিবীর দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। পৃথিবী, সোম, অগ্নি ছিল পৃথিবীর দেবতা। ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ ছিল বায়ুমন্ডলের দেবতা এবং দৌ, বরুণ, সূর্য, সাবিত্রী, মিত্র, বিষ্ণু ইত্যাদি ছিল স্বর্গের দেবতা।

বরুণ ছিলেন পাপ-পূণ্যের দেবতা এবং অত্যন্ত সন্মানিত।তিনি ছিলেন বিশ্বজগতের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। ইন্দ্র ছিলেন ঝড় ও যুদ্ধের দেবতা। অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে ইন্দ্র আর্যদের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় দেবতারূপে পূজিত হতেন। যম ছিলেন মৃত্যুর দেবতা। বায়ু ছিলেন বাতাসের দেবতা। অগ্নি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি যজ্ঞের আহুতি গ্রহণ করে তা দেবতাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্র। প্রতি ঘরেই একটি ছোট অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে রাখা হতো। অগ্নিসাক্ষী রেখেই বিয়ে সম্পন্ন হতো, যেমনটি এখনও হয়।পঞ্চ উপাদানের মধ্যে অগ্নি ছিল সবচেয়ে পবিত্র। তাঁকে আহুতি না দিয়ে কোন যজ্ঞই সম্পন্ন করা যেতো না। সোম ছিলেন পানীয়ের দেবতা। কখনও কখনও দেব-দেবীকে পশুর আকারে কল্পনা করা হয়েছে, যেমন ইন্দ্রকে ষাঁড় এবং সূর্যকে দ্রুতগামী অশ্বরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উল্লেখ্য যে, ঋগ্বৈদিক ভারতে পশু-পূজার প্রচলন ছিলনা ।

ঋগ্বৈদিক আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করতো এবং বিভিন্ন দ্রব্য যেমন দুধ, ঘি, শস্য, সোমরস ও মাংস আহুতি দিতো। দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। ঋগ্বৈদিক আর্যদের ধর্ম ছিল যজ্ঞকেন্দ্রিক। পারিবারিক যজ্ঞে সাধারণ জিনিস আহুতি দেওয়া হতো। কিন্তু কালক্রমে বিশাল আকারে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয় যাতে শুধু একটি গ্রামই নয়, গোটা উপজাতিই অংশ নিত এবং তখন বহু পশু বলি দেওয়া হতো। নিয়ত যুদ্ধরত উপজাতিগুলোর জন্য দেবতাদের আশীর্বাদ ছিল অত্যাবশ্যকীয় এবং তারা বিশ্বাস করতো যে যজ্ঞে সন্তুষ্ট হলে দেবতা বরদান করেন। এমনও বিশ্বাস করা হতো যে দেবতারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং জয় নিশ্চিত করেন। যজ্ঞের একটা সামাজিক দিকও ছিল। যজ্ঞ ছিল চিত্তবিনোদনের একটা উপায় এবং আনন্দ-উল্লাসের সময়। যজ্ঞের পরে প্রায় সকলেই সোমরস পান করতো। কালক্রমে যজ্ঞ ও মন্ত্রাদি অত্যন্ত দীর্ঘ জটিল হয়ে পড়ায় পূজা ও যজ্ঞের জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন দেখা দেয়। তার ফলেই আর্য সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই যজ্ঞের সুত্র ধরেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজে গুরুত্ব লাভ করে। ধারণা করা হতো যে তাঁর কিছু রহস্যপূর্ণ ও জাদুবলের ক্ষমতা (ব্রহ্ম) আছে এবং এজন্যই তিনি ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত। কালক্রমে এই ধারণারও সৃষ্টি হয় যে দেবতা, পুরোহিত এবং অর্ঘ্য কোন এক মুহূর্তে এক হয়ে যায়।স্বাভাবিকভাবেই যজ্ঞানুষ্ঠান পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়, কারণ তাঁকে ছাড়া যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলনা। এই যজ্ঞানুষ্ঠান রাজারও ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটায়। কারণ, বিশাল আকারে সম্পাদিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। এসব যজ্ঞের কৌতূহলোদ্দীপক কিছু উপজাতও দেখা যায়। যজ্ঞের স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের স্থাপনে কিছুটা গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হওয়ায় গণিত সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় । প্রায়ই পশুবলি দেওয়া হতো বলে পশু দেহতত্ত্ব সম্পর্কেও মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটে।

ঋগ্বৈদিক যুগে আর্যরা মূর্তি পূজা করতো না। বলি এবং দুধ, শস্য, ঘি, মাংস এবং সোমরস নৈবেদ্য দিয়েই পূজা সম্পন্ন করা হতো। বর্তমান কালের পূজার ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান তখন ছিলনা।

ঋগ্বৈদিক যুগে দেবীদের স্থান ছিল দেবতাদের তুলনায় গৌণ। উষা, পৃথিবী, সরস্বতী, অদিতির মতো দেবীরা ছিলেন তাঁদের স্বামীদের পাশে নিস্প্রভ। উল্লেখ্য যে সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃদেবী ও শিব ছিলেন সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ঋগ্বেদের রচনাকাল ছিল দীর্ঘ। অধ্যাপক ব্যাশামের মতে, এটা রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৯০০ অব্দের মধ্যে।ফলে এ দীর্ঘ সময়কালে আমরা ঋগ্বৈদিক দেব-দেবীদের গুরুত্ব ও অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাই।দেবী পৃথিবীর গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং আকাশের দেবতা দৌ-এর স্থান অধিকার করেন বরুণ। কিছুদিনের মধ্যেই বরুণও তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং ইন্দ্র হয়ে পড়েন ঋগ্বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আদিতে সরস্বতী ছিলেন নদ-নদীর দেবী। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বিদ্যা-দেবী হিসাবে পূজিত হন। কিন্তু গোটা ঋগ্বৈদিক যুগেই অগ্নি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঋগ্বৈদিক ধর্মের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য, একেশ্বরবাদও লক্ষণীয়।স্তোত্রগুলোতে এক সৃষ্টিকর্তার ধারণা প্রকাশ পায়। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব হলো সৃষ্টিকর্তার বহু নাম থাকলেও তিনি এক ও অভিন্ন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি নামে তিনি অভিহিত। এককেই কবিরা বহু নাম দিয়েছেন।

মৃতদেহ সৎকারের দুটি পদ্ধতি ছিল। মৃতদেহ কবর দেওয়া হতো অথবা পোড়ানো হতো। আগুন পবিত্রতা দান করে এ ধারণার কারণে মৃতদেহ পোড়ানো অধিকতর জনপ্রিয় রীতিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে এটাই মৃতদেহ সৎকারের একমাত্র রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

ঋগ্বৈদিক আর্যদের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পর পাপীদের শাস্তি ও পূণ্যবানদের পুরস্কার দেওয়া হয়। পাপীরা নরকে এবং পূণ্যবানরা স্বর্গে স্থান লাভ করতো।পরের দিকের কিছু স্তোত্রে মৃত্যুর পর আত্মার গাছ, লতাপাতায় দেহান্তর গ্রহণের ইঙ্গিত থাকলেও পুনর্জন্মের ধারণা সে সময় ছিল অস্পষ্ট। তবে শেষ পর্যন্ত এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে এটা থেকেই উদ্ভব হয় পূর্বজন্মের আচরণের ভিত্তিতে আত্মার সুখ বা দু:খে পুনর্জন্মের তত্ত্ব।এটা পরবর্তীকালে কর্মফলের তত্ত্বে বিকাশ লাভ করে।কর্মফল তত্ত্ব হয়ে পড়ে জাতিভেদ প্রথার

দার্শনিক যুক্তি।এ তত্ত্ব অনুসারে উচ্চ বা নীচ বংশে জন্মগ্রহণ পূর্বজন্মের কার্যাবলীর ওপর নির্ভরশীল এবং এটা পরবর্তী জন্মে একজনকে সামাজিক উন্নতি লাভের আশা যোগায়।

রাজনৈতিক অবস্থা

ঋগ্বৈদিক যুগে আর্যদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বিশ এবং কয়েকটি বিশ নিয়ে গঠিত হতো জন। গ্রামের প্রধানকে বলা হতো গ্রামণী। বিশের প্রধানকে বিশপতি এবং জনের প্রধানকে গোপ বা রাজা।

প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। তবে অরাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারও উল্লেখ পাওয়া যায়। উপজাতির প্রধান হিসাবে গণপতি বা জ্যেষ্ঠের উল্লেখ প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত দান করে।

সে যুগে রাজ্য ছিল প্রধানত রাজার শাসনাধীন। তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংসকারী। রাজপদ সাধারণত বংশানুক্রমিক। ঋগ্বেদে স্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকলেও নির্বাচিত রাজতন্ত্র থাকাটাও অস্বাভাবিক ছিলনা। তবে রাজার সার্বভৌম অধিকার স্থায়ী ও দৃঢ় হওয়ার জন্য জনসমর্থনের প্রয়োজনীতার কথা ঋগ্বেদে আছে।

গোষ্ঠীর মধ্যে রাজা এক বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। আনুষ্ঠানিক অভিষেকের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাসীন হতেন। তিনি বিলাসবহুল প্রাসাদে বাস করতেন এবং তাঁর ঝলমলে পোষাক দিয়েই তাঁকে চেনা যেতো।

ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এবং অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে রাজা ছিলেন মূলত একজন সামরিক নেতা। উপজাতি এবং তাঁর সম্পত্তি রক্ষা করা ছিল রাজার প্রধান কর্তব্য। তিনি প্রজাদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় দান করা উপহার গ্রহণ করতেন। ঋগ্বেদে বলির উল্লেখ থাকলেও এটা নিয়মিত কর ছিলনা। যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশও তিনি পেতেন। ধর্মের ব্যাপারে প্রথম দিকে রাজার তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা। পরবর্তীকালে রাজার দৈবত্বের ধারণার উদ্ভব হয়। পুরোহিত যজ্ঞের মাধ্যমে রাজার ওপর দৈবত্ব আরোপ করতেন।

শাসনকাজে রাজাকে সাহায্যকারী কিছু কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়।তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পুরোহিত। তিনি বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করতেন এবং প্রজাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতেন। পুরোহিত ছিলেন রাজার অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা। তিনি যাগ-যজ্ঞ ও মন্ত্রের মাধ্যমে রাজার সাফল্য নিশ্চিত করতেন। তিনি রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকতেন। অপর একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন সেনানী বা সেনাপতি। তখনকার সেনাবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। সেনাবাহিনীতে পদাতিক ও রথারোহী সৈন্য ছিল। কোন কোন যুদ্ধ স্তোত্রে লাফানো ঘোড়ার উল্লেখ আছে। তবে এ যুগে যুদ্ধে হাতির ব্যবহার ছিলনা। যোদ্ধারা ধাতব বক্ষাবরণ, ধাতব শিরস্ত্রাণ পরতো। তীর-ধনুক ছিল প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। এছাড়া বর্শা, তরবারি এবং কুঠার ব্যবহৃত হতো। কুলপ বা পরিবার প্রধানরা ব্রজপতি বা গ্রামণীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করতো। দুর্গ ছিল পুরোহিতের অধীনে। শত্রুর ও রাজ্যের প্রজাদের খবরাখবর জানার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করতেন।

রাজা জনগণের প্রভু হলেও তাদের মতামতের মূল্য দিতেন। এ প্রসঙ্গে সভা ও সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য। সমিতিতে অভিজাতবর্গ ও সাধারণ মানুষ সমবেত হতো।সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকা রাজার কর্তব্য ছিল। ঋগ্বেদের যুগে সমিতি যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল। ঋগ্বেদে জনসাধারণকে সমিতির অধিবেশনে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং একই মতে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে রাজার পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া কঠিন ছিল। সভা ছিল বয়স্ক ও অভিজাত ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান। সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রথমদিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেও পরের দিকে একমাত্র বিচারের ক্ষেত্রেই সভার ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পরে।

এ যুগে কোন নিয়মিত বিচারালয় ছিলনা।প্রথাই ছিল আইন।রাজা পুরোহিত এবং সম্ভবত বয়োবৃদ্ধ দু'একজনের সহায়তায় বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। অপরাধের মধ্যে বেশি সংঘটিত হতো চুরি, বিশেষত গরু চুরি। নরহত্যার শাস্তি ছিল একশত গাভী দান। মৃত্যুদন্ডের প্রচলন তখন ছিলনা বলেই মনে হয়। বিচারের সময় অপরাধ নির্ণয়ের জন্য অপরাধীকে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হতো, যেমন উত্তপ্ত কুঠারে জিহ্বা স্পর্শ করে অভিযুক্তকে তার নির্দোষত্ব প্রমাণ করতে হতো।

পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্য সভ্যতা

পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল ঃ

সামাজিক অবস্থা

এযুগেও ঋগ্বৈদিক যুগের মত সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পরিবার। গৃহনির্মাণ বা পোশাকের ক্ষেত্রে এ যুগে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। খাদ্যের ক্ষেত্রে মাংসাহারকে ভাল চোখে দেখা হতো না। কিন্তু তখনও অতিথি আপ্যায়নে বা উৎসব উপলক্ষে গরু বা ছাগল হত্যা করা হতো। পানীয় হিসাবে আগের মত সোম ও সুরা ব্যবহার করা হতো। অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ যুগে শৈলুষ বা অভিনেতা এবং গাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎসবাদিতে বীণাবাদকগণ গাঁথাগুলো গাইতেন।শততন্তু (শততন্ত্রী বিশিষ্ট) বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এ যুগে সঙ্গীতের উৎকর্ষের পরিচায়ক।

এ যুগের সমাজ ব্যবস্থায় দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এ যুগে নারীর মর্যাদা অনেক হ্রাস পায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কন্যার জন্মের জন্য শোক প্রকাশ এবং পুত্রের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হতো। এ যুগে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ বৃদ্ধি পায়। নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অধিকার হারায়।ধর্মাচারণে পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদের পুরুষের সঙ্গে ধর্মাচারণের অধিকার কমে যায়। এ যুগেও গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতা মহিলার কথা জানা যায়। তবে সাধারণভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদার যে অবনয়ন ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ যুগে পূর্বের পেশাভিত্তিক চারটি শ্রেণীর স্থলে বংশগত চারটি জাতির উদ্ভবের লক্ষণ দেখা দেয়। এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী থেকে আলাদা রাখার জন্য কঠোর নিয়ম প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ যুগে বৈশ্য ও শূদ্র কন্যাকে বিয়ে করতে পারলেও এর বিপরীত ব্যাপারটি ছিল অসম্ভব। বর্ণ বা শ্রেণী পরিবর্তন অসম্ভব না হলেও ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের মধ্যে বিরোধেরও সুত্রপাত হয়। তাঁরা এমন অনেক সুবিধা ভোগ করতেন যা বৈশ্য বা শূদ্রদের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব ছিলনা। সমাজ জীবনে যজ্ঞানুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরোহিতদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ নিজেকে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজ্যের রক্ষক বলে দাবী করতেন। ক্ষত্রিয়রা রাজকার্য ও যুদ্ধ করে শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে এবং এ যুগে অস্পৃশ্যতার সূচনা হয়। শূদ্রকে মনে করা হতো অপবিত্র এবং সে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে তৈরি নৈবেদ্য স্পর্শও করতে পারতো না। একজন ছুতোর মিস্ত্রীর ছোঁয়াকে অশুচি বলে মনে করা হতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ যুগে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এ যুগেও বিত্তশালী ব্যক্তিসহ মানুষ প্রধানত গ্রামেই বাস করতো। কিন্তু নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা তাদের অজ্ঞাত ছিলনা। এ যুগে বেশ কয়েকটি নগরের উদ্ভব ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে নগরের উদ্ভব ঘটে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় অর্থনীতিতে শ্রাবস্তি, চম্পা, রাজগৃহ, অযোধ্যা, কৌশাম্বী এবং কাশী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মৃৎশিল্প, ছুতারগিরি, বয়নশিল্প ইত্যাদির মতো শিল্পে বিশেষজ্ঞতা অর্জনকারী গ্রাম ও ব্যবসা

কেন্দ্রগুলোকে কেন্দ্র করে নগরগুলোর উদ্ভব হয়। বিশেষজ্ঞ কারিগরদের মধ্যে একত্র জড় হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ, এতে কাঁচামাল পরিবহন ও উৎপাদিত পণ্যের বিতরন সহজতর হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে উপযুক্ত মানের কাঁদামাটির প্রাপ্যতা মৃৎশিল্পীদের বড় সংখ্যায় কোন একটি এলাকায় জড় হতে উৎসাহিত করে। কাজেই কোন নগরে কারিগরদের শ্রেণীকরণ তাদেরকে ব্যবসায়ী ও বাজারের নিকটবর্তী করে তোলে।

কৃষিক্ষেত্রে এ যুগে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। উর্বর নদী-উপত্যকা দখল এবং দক্ষ কৃষিজীবি দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই সম্ভবত এটা হয়েছিল। এ যুগে কৃষিকাজে লোহার লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়। লোহার লাঙল টানার জন্য কখনও কখনও একসঙ্গে ২৪টি গরুর প্রয়োজন হত। কৃষির প্রয়োজনে এ সময় মহিষকে পোষ মানানো হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ পদ্ধতি ও সার প্রয়োগ প্রথার উন্নতি ঘটে। শিম, তিল ইত্যাদি নতুন ফসল উৎপাদন শুরু হয়। শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, খরা অতিবৃষ্টি চাষের ক্ষতি করতো। এ যুগের অর্থনীতিতে গরু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। ফলে যজ্ঞের প্রয়োজন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। এ যুগে যুদ্ধের প্রয়োজনে হাতিকে পোষ মানানো হয়।

এ যুগে জমির মালিক ছিল পরিবার।পরিবারের লোকেরাই জমি চাষ-আবাদ করতো। তবে এ সময় জমিদার শ্রেণীর উদ্ভবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তারা অনেক জমির মালিক হলেও নিজ হাতে চাষ-আবাদ করতোনা। জমি হস্তান্তর সম্পর্কে কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করা হয়।

পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ব্যবসার কাজ অনেকক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। কাপড়, ছাগলের চামড়া ও অন্যান্য পোশাকের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হত। পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব পর্যন্ত বাণিজ্য চলতো। কিরাত নামে এক উপজাতি ওষুধের বিনিময়ে বস্ত্র ও চামড়া নিতো। স্থলপথে রথ বা গরুর গাড়ী এবং নদী পথে নৌকায় পণ্য বহন করা হতো। এ যুগে সমুদ্র আর্যদের কাছে অপরিচিত ছিলনা। সে যুগে সম্ভবত মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। নিষ্ক, শতমান এবং কৃষ্ণল নামে মুদ্রার প্রচলনের ফলে ব্যবসায়িক লেন-দেন কিছুটা সহজ হয়েছিল। তবে এ যুগেও এগুলো মুদ্রার সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল কিনা সে সম্পর্কে পন্ডিতদের সন্দেহ আছে। বণিকরা সম্ভবত সংঘ গঠন করেছিল - 'গণ' এবং 'শ্রেষ্ঠীর' উল্লেখ থেকে এ ধারণা পাওয়া যায়।

শিল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এ যুগে একজন ছুতোর মিস্ত্রি এবং একজন রথ নির্মাতার মধ্যে পার্থক্য ছিল যদিও দুজন কাঠের কাজ করতো। ধনুক যে তৈরি করতো সে ধনুকের ছিলা তৈরি করতো না - সেটা ছিল অন্য একজন দক্ষ লোকের কাজ। পূর্বের সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের সাথে এ যুগে লোহা, সীসা এবং টিনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সে যুগে কর্মজীবনে মহিলাদেরও ভূমিকা ছিল। তারা সূচি শিল্পে ও রঞ্জন শিল্পে অংশগ্রহণ করতো।

ধর্মীয় অবস্থা

এ যুগে ধর্মের ক্ষেত্রেও আর্যদের জীবনে বেশ বড় পরিবর্তন দেখা যায়। যজ্ঞ আগের তুলনায় অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যজ্ঞকে দেবতাদের ওপরে স্থান দেওয়া হয়। যজ্ঞের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং একমাত্র পুরোহিতই যজ্ঞ সম্পাদনে দক্ষ হওয়ায় এ যুগে সমাজে পুরোহিতদের সংখ্যা এবং মর্যাদা বেড়েছিল। জটিলতার কারণে এখন একটি যজ্ঞে কয়েকজন পুরোহিতের প্রয়োজন হতো।

এ যুগে দেবদেবীর পারস্পরিক অবস্থান ও গুরুত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী বেদগুলোতে মাঝে মাঝে ঋগ্বৈদিক দেবদেবী বরুণ এবং পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্র দেখা গেলেও এ যুগে প্রজাপতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা হয়ে ওঠেন। তাঁকে সকল জীবের দেবতা রূপে গণ্য করা হতো। ঋগ্বৈদিক যুগের অন্য দুজন দেবতা রুদ্র এবং বিষ্ণুও এ যুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। রুদ্র আগে শিবরূপে পরিচিত ছিলেন, এ যুগে তিনি মহাদেব এবং পশুপতি নামে পরিচিত হন। বিষ্ণু এ যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে মহাজাগতিক এবং নৈতিক বিন্যাসের উৎস, দুঃখে মানুষের মুক্তিদাতা এবং দেবতাদের ত্রাতারূপে গণ্য করা হয়।

এ যুগে শয়তান, জাদুমন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন কুসংস্কার মানুষের মনে দেখা দেয়। এ যুগে ঋগ্বেদের একেশ্বরবাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। এ যুগে অবতারবাদের ধারণার সূচনা হয়। এ যুগেই মানুষের মনে নানা ধরনের নতুন চিন্তা ও প্রশ্নের উদ্রেক হয়। যজ্ঞ এবং পশুবলির কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের মনে প্রশ্ন জাগে। এসবের কোনো কোনো প্রশ্ন সন্ন্যাসের জন্ম দেয়- মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জনবসতি থেকে দূরে বাস করতে থাকে। মানুষের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে- দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন ও ধ্যান দ্বারা রহস্যপূর্ণ শক্তি, জাদুবল অর্জন করা অথবা শারীরিকভাবে সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সামাজিক আচার, বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি লাভ করা।

রাজনৈতিক অবস্থা

পরবর্তী বৈদিক যুগে গঙ্গা-যমুনা গন্ডক উপত্যকায় আর্য বসতি বিস্তার লাভ করে। পূর্বমুখী এ আর্য সম্প্রসারণের একাধিক কারণ ছিল। পুরোহিতরা আরো বেশি ভূমিকে বৈদিক ধর্মের আওতায় আনতে চেয়েছিল। তাছাড়া শক্তিশালী উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজাদের রাজ্যজয়ও তাদের এ অঞ্চলে নিয়ে এসেছিল। এ যুগে পশ্চিমাঞ্চল গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং মধ্যদেশ আর্যদের কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি। ঋগ্বৈদিক যুগে আর্য উপজাতিগুলো নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত হতো। ফলে সফল সামরিক রাজার অধীনে অনেক উপজাতির একত্রিকরণ ঘটতো এবং রাজ্যের আয়তনেরও বিস্তৃতি ঘটতো। অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলেও রাজ্যের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে। ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে রাজা এখন নিজেকে তাঁর প্রজাদের একচ্ছত্র প্রভুরূপে বিবেচনা করতে থাকেন। তিনি এখন প্রজাদের কাছ থেকে বলি, শুল্ক ও ভাগ নামক করও আদায় করতে থাকেন। তাঁর দায়িত্বের অবশ্য তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি-আগের মতই তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল সামরিক ও বিচার বিষয়ক। তিনি ছিলেন প্রজাদের জানমালের রক্ষক এবং শত্রু ধ্বংসকারী। সফল ও শক্তিশালী রাজারা 'রাজা বিশ্বজনীন' , 'সর্বভূমি', 'একরাট' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী 'রাজসূয়', 'বাজপেয়' এবং 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' উদযাপন করতেন। রাজা সবসময় না হলেও, সাধারণত হতেন ক্ষত্রিয়। সাধারণত রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক যদিও মাঝে মধ্যে নির্বাচিত রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নির্বাচন রাজপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো।

এ যুগে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অভিষেকের সময় রাজাকে সিংহাসন থেকে নেমে এসে ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হতো। এ সময় তিনি ব্রাহ্মণ ও গোধনকে রক্ষা এবং জনহিতকর কাজ করার অঙ্গীকার করতেন। আগের তুলনায় সমিতির গুরুত্ব হ্রাস পেলেও এ যুগেও সভা তার গুরুত্ব বজায় রাখে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজার সমৃদ্ধির জন্য সভার সঙ্গে রাজার মতৈক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

রাজক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনযন্ত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটে। ঋগ্বৈদিক আমলে পুরোহিত, সেনানী ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারীর উল্লেখ দেখা যায়না।কিন্তু এ যুগে বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সংগ্রহিত্রী (কোষাধ্যক্ষ), ভাগদুগ (কর আদায়কারী), সূত (রাজকীয় ঘোষক বা রথ চালক), ক্ষত্রী (রাজ সংসারের সরকার), অক্ষবাপ (জুয়া খেলার অধ্যক্ষ) এবং গো-বিকর্তন (শিকারের রাজসঙ্গী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগে একাধিক সংগ্রহিত্রী ও ভাগদুগের অন্যদিকে বলি ও শুল্কের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে কর ও রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। রাজপরিবারের সদস্য ও ব্রাহ্মণদের কোন কর দিতে হতো না। 'স্থপতি' ও 'শতপতির' উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে এ যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীকে বলা হতো স্থপতি। এ জাতীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত ছিল অনার্য। শতপতির দায়িত্ব ছিল একশত গ্রামের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা।

বিচার ব্যবস্থায় রাজার বিশেষ ভূমিকা থাকলেও তিনি সব সময় নিজে বিচার না করে সে দায়িত্ব অধ্যক্ষদের ওপর অর্পণ করতেন।

সারসংক্ষেপ

আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে ভারতবর্ষে আগমন করে। ক্রমে তারা এখানে গড়ে তোলে আর্যসভ্যতা। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদ (পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ) থেকে ভারতে তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায়। বেদ চারভাগে বিভক্ত– ঋক্, সাম, যজুর এবং অথর্ব। ঋগ্বেদের সম্ভাব্য রচনাকাল ১৫০০-৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এবং অন্য তিনটি ৯০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। বেদের রচনাকালের ওপর নির্ভর করে আর্যসভ্যতাকে দুভাগে ভাগ করা হয়– ঋগ্বৈদিক যুগের সভ্যতা এবং পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা। উভয় যুগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল বিধায় আর্যদের জীবনচর্চায় সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের যুগে পাঞ্জাব ছিল আর্যসভ্যতার কেন্দ্রভূমি। কালক্রমে তারা ভারতের পূর্বদিকে বসতি বিস্তার করে এবং মধ্যদেশ তাদের কর্মকান্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আমরা বলতে পারি, ঋগ্বৈদিক যুগে আর্য সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ক্রমে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ শুরু করে, তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে তা সুসংহত ও সুসংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. ঋগ্বেদের রচনা কাল ছিল-
   (ক) ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (খ) ১৫০০-৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
   (গ) ৯০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (ঘ) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

২. ঋগ্বেদের যুগে সাধারণত প্রচলিত ছিল-
   (ক) বহু বিবাহ (খ) বহুপতিত্ব
   (গ) একবিবাহ (ঘ) বাল্য বিবাহ

৩. ঋগ্বেদের যুগে পরিবারের প্রধানকে বলা হতো-
   (ক) গ্রামীণ (খ) পুরোহিত
   (গ) পুরপতি (ঘ) কুলপ

৪. ঋগ্বেদ যুগে আর্য সমাজ বিভক্ত ছিল-
   (ক) পাঁচটি (খ) সাতটি
   (গ) চারটি (ঘ) দশটি শ্রেণীতে

৫. ঋগ্বেদ যুগে আর্য জীবন ছিল-
   (ক) চারটি (খ) ছয়টি
   (গ) আটটি (ঘ) বারটি পর্যায়ে বিভক্ত

৬. বৈদিকযুগে কৃষিযোগ্য ভূমিকে বলা হতো-
   (ক) উষর (খ) বন
   (গ) উর্বর (ঘ) মরুভূমি

৭. ঋগ্বৈদিক যুগে শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন-
   (ক) ইন্দ্র (খ) অগ্নি
   (গ) বরুণ (ঘ) সোম

৮. পরবর্তী বৈদিক যুগে কোষাধ্যক্ষকে বলা হতো-
   (ক) ভাগদুগ (খ) ক্ষত্রি
   (গ) সংগ্রহিত্রী (ঘ) সূত

৯. পরবর্তী বৈদিক যুগে উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন-

(ক) লোপামুদ্রা (খ) মমতা
(গ) অপালা (ঘ) গার্গী

১০. পরবর্তী বৈদিক যুগে শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন-
(ক) রুদ্র (খ) ইন্দ্র
(গ) বরুণ (ঘ) প্রজাপতি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ঋগ্বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান কিরূপ ছিল?
২। ঋগ্বৈদিক যুগে যজ্ঞের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।
৩। ঋগ্বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগের জাতিভেদ প্রথার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ঋগ্বৈদিক যুগে আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করুন।
২. পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।
৩. পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে আপনি কি কি পরিবর্তন লক্ষ করেন ?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People*, Vol-1, *Vedic Age.*
২। R.C. Majumdar, H.C. Raychowdhury, KK Datta, *An Advanced History of India.*
৩। V.A. Smith, *The Oxford History of India.*
৪। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা।*
৫। রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস।*

পাঠ - ৩

জৈন ধর্ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি

- জৈন ধর্মের উদ্ভবের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীরের জীবনী ও শিক্ষাবলীর বিবরণ দিতে পারবেন।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এক প্রচন্ড আলোড়ন দেখা দেয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এ চিন্তা শুধুমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না- গ্রিস, মিশর, ব্যাবিলনিয়া, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশগুলোতেও ধর্ম বিপ্লব দেখা গিয়েছিল।এ আলোড়নের কারণগুলো অন্যান্য দেশে কি ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ভারতে এটা ছিল মুখ্যত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা এবং মুক্তির উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও শিক্ষা নিয়ে এ সময় বহু নতুন ধর্মের উদ্ভব হয় যার মধ্যে ভারতে প্রধান দুটি ছিল জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। ভারতে এ দুটি ধর্মের উদ্ভবের বহু কারণ ছিল।

বৈদিক ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে কোন গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। দুই উচ্চবর্ণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ছাড়া বৈদিক ধর্মাচরণ অন্যান্যরা পালন করতো না। সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যরা তাদের নিজেদের ধর্মই পালন করতো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পশুবলি ও ব্যয়বহুল এবং জটিল অনুষ্ঠানাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে ঋগ্বৈদিক যুগের সহজ ও অনাড়ম্বর পূজা পদ্ধতি নিস্প্রাণ ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, যা ধর্মপ্রাণ মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাতে ব্যর্থ হয়। পশুবলির আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যয়বহুলতা অনেককেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। পশুবলি অনেকের মনেই আঘাত দেয়। ব্রাহ্মণরা ব্যয়বহুল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে ক্ষত্রিয়দের বাধ্য করতো। কর ও জমির আয় থেকে ক্ষত্রিয় শাসকরা যা আয় করতো ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তা নিয়ে নিত। এক একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর রাজাকে বহু সোনা, রূপা, দাস-দাসী, গাভী, খাদ্য ও বস্ত্র দান করতে হতো। ফলে ক্ষত্রিয়রা প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে। ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ ও নিষ্ঠুর পশুবলিতে আত্মার মুক্তিলাভ সহজ হয় কিনা সে সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ফলে মানুষ একটি সহজতর ধর্মের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ব্যাখ্যা নিয়েও ব্রাহ্মণদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তা ছাড়া জীবনধারণের প্রয়োজনে ব্রাহ্মণরা ধর্মকর্ম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের জাগতিক পেশায় নিয়োজিত হয়। এর ফলে তাদের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাস কমে যায়।

বর্ণপ্রথার কঠোরতাও নতুন ধর্মের উদ্ভবে সহায়ক হয়েছিল। ব্রাহ্মণরাই শুধু বেদ স্পর্শ করতে পারতো। সমাজে তারাই বিবেচিত হতো শ্রেষ্ঠ শ্রেণী হিসাবে। ব্রাহ্মণদের এ শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কেউই সহজভাবে গ্রহণ করেনি। এ সময়ে এ দুই শ্রেণীরই যথেষ্ঠ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেছিল। ফলে তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করতে থাকে।

ক্ষত্রিয়রা দেশ শাসন করতো। তারা যুদ্ধ করে দেশকে রক্ষা করতো। এ যুগে লোহার ব্যবহার শুরু হওয়ায় লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র তাদের আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলে। ফলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।

লোহার ব্যবহার কৃষি ও বাণিজ্যে লিপ্ত বৈশ্যদের আরো ধনী করে তোলে। লোহার লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে কৃষিকর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটলে তারা আরো বিত্তশালী হয়ে ওঠে। যাগযজ্ঞে এক সঙ্গে বহু পশুবলি দেওয়ায় কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটে বলে তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করতে থাকে। এ সময় বাণিজ্য ও

শিল্পের প্রসারও বৈশ্যদের ধনশালী করে তোলে। তখন তারাও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বা শ্রেষ্ঠত্ব মানতে অস্বীকার করে।

তাছাড়া বৈদিক ধর্মে সমুদ্র যাত্রাকে সুনজরে দেখা হতো না। কিন্তু বাণিজ্যের জন্য বণিকদের সমুদ্র পাড়ি দিতে হতো। বৈদিক ধর্মে সুদের ব্যবসাকেও পাপ বলে ঘোষণা করা হয় এবং সুদ ব্যবসায়ীদের নীচু চোখে দেখা হতো। অথচ মহাজনদের সুদের ব্যবসা করতে হতো। এ কারণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে তারা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি।

অধ্যাপক ব্যাশাম বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের বিকাশ মানুষের মনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছিল।পুরনো উপজাতীয় ও পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে বা ভেঙ্গে যায় এবং তাদের জায়গায় আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে ওঠে। এগুলো শাসন করতো স্বেচ্ছাচারী ও যুদ্ধপ্রিয় রাজারা। এ যুগে নগরের উদ্ভব হয় যেখানে বিভিন্ন উপজাতির ছিন্নমূল মানুষ এসে আশ্রয় নেয়। জীবনযাত্রা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকলে মানুষের মনে অস্থিরতা জন্ম নেয়। রাজারা যখন রাজ্যের সীমানা এবং ব্যবসায়ীরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যস্ত তখন বহু সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে বর্তমান জীবন সন্তোষজনক মনে হয়নি। তারা তখন গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করে মুক্তির নতুন পথ খুঁজতে থাকেন। কাজেই দেখা যায় যে নতুন ধর্মগুলোর উদ্ভবের বহু আগে থেকেই ভারতীয় চিন্তাজগতে এমন অগ্রগতি ঘটেছিল যার ফলে নতুন ধর্মের বিকাশের পথ তৈরি হয়েছিল।

জৈন ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে বর্ধমান মহাবীরের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জৈন কিংবদন্তী অনুসারে ২৪ জন তীর্থঙ্কর এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বর্ধমান মহাবীর ছিলেন শেষ তীর্থঙ্কর। মহাবীর ছাড়া অন্য তীর্থঙ্করের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁর পূর্বসুরী পার্শ্বনাথই ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, অন্যদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

পার্শ্বনাথ ছিলেন বেনারসের রাজা অশ্বসেনের পুত্র। মহাবীরের প্রায় ২৫০ বছর আগে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ৩০ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং ৮৪ দিন সাধনার পর সত্যজ্ঞান লাভ করেন। জীবনের অবশিষ্ট ৭০ বছর তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর প্রধান চারটি শিক্ষা ছিল, (১) প্রাণী হত্যা না করা (২) মিথ্যা কথা না বলা (৩) চুরি না করা এবং (৪) সম্পত্তির অধিকারী না হওয়া। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এর সাথে সংসারী না হওয়ার শিক্ষা যোগ করেছিলেন।

শেষ বা ২৪তম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর আনুমানিক ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশালীর নিকটবর্তী কুন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন জ্ঞাত্রিক গোষ্ঠীর নেতা এবং মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবি বংশের কন্যা। যুবরাজ হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহাবীর ছিলেন বিবাহিত এবং এক কন্যার জনক। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ৩০ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং প্রায় ১৩ মাস ধরে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করেন। এর পর তিনি তাঁর গায়ের পোশাকও ত্যাগ করেন। জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ত্রয়োদশ বছরে তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন এবং কেবলিন (সর্বজ্ঞ), জিন (জয়ী) এবং মহাবীর আখ্যা লাভ করেন। জীবনের অবশিষ্ঠ ৩০ বছর তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন এবং ৭২ বছর বয়সে রাজগৃহের নিকটবর্তী পাবা নগরে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবত ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে। উল্লেখ্য যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে সব রাজা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁরা জৈন ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

প্রথম দিকে জৈন ধর্ম প্রধানত মগধ, কোশল, বিদেহ এবং অঙ্গ রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মৌর্য যুগে জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কলিঙ্গরাজ খরবেলও জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

জৈনরা বেদকে ঐশ্বরিক গ্রন্থরূপে স্বীকার করেনা। তারা আত্মার মুক্তিলাভে পশুবলির কার্যকারিতাও স্বীকার করে না। অহিংসা নীতিকে তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করে। ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একথাও জৈনরা মানেনা। তাদের মতে বিশ্ব জগৎ এবং মানুষের জীবন সব কিছুই এক সার্বজনীন নিয়মের অধীন। নিয়মটা হল এই যে উত্থানের পর পতন এবং পতনের পর উত্থান আসবে। উন্নতির পর্যায় শেষ হলে অবনতি আসবে

এবং প্রতি পর্যায়ে তীর্থঙ্কর আসবেন পথ প্রদর্শক হিসাবে। জৈনরা গাছপালা, পাহাড়, পাথর, নদী - সব কিছুতেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে। তারা হিন্দুদের মত কর্মফলে বিশ্বাসী। গত জীবনের কর্মফল থেকে মুক্তিলাভই তার লক্ষ্য। এ মুক্তি লাভের তিনটি উপায় আছে যথা - সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান এবং সৎ আচরণ, যা একসঙ্গে ত্রি-রত্ন নামে পরিচিত। মুক্তিলাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর তারা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে।

জৈনদের বিশেষ কোন সামাজিক রীতিনীতি নেই। জন্ম, মৃত্যু বা বিয়ের মত তাদের আচার-অনুষ্ঠানগুলো হিন্দুদের মতই। খ্রিস্টিয় শতকের গোড়ার দিকে জৈন মন্দিরে তীর্থঙ্কদের মূর্তি স্থান লাভ করে। মধ্যযুগে জৈন পূজা পদ্ধতি হিন্দুদের মত হয়ে পড়ে- ধূপ, ফুল ইত্যাদি দিয়ে তারা তীর্থঙ্করদের পূজা করতে শুরু করে। এমনকি প্রধান প্রধান কিছু হিন্দু দেবতার মূর্তিও জৈন মন্দিরগুলোতে স্থান লাভ করে।

একজন জৈন ভিক্ষুর জীবন অত্যন্ত কঠোর নিয়মে আবদ্ধ। দীক্ষা গ্রহণের সময় তারা মাথার চুল না কামিয়ে টেনে টেনে তোলা হতো। আত্ম-নিপীড়ন মুক্তিলাভের সহায়ক - এ বিশ্বাস থেকে জৈনরা নিজেদের অসহ্য যন্ত্রণা দিতো। প্রখর রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা অথবা পীড়াদায়ক ভঙ্গিতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা তাদের জন্য ছিল মুক্তিলাভের সাধারণ উপায়। অহিংসার ব্যাপারেও তারা ছিল চরমপন্থী। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনভাবেই যেন জীবহত্যা না হয় সে ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সজাগ থাকে। সংসারী বা ভিক্ষু - সবার জন্যই মাংস ভক্ষণ ছিল নিষিদ্ধ। তারা খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে পানি ছেঁকে খেত। পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে কোন কীটপতঙ্গ যেন মারা না যায় সে জন্য রাস্তায় হাঁটার সময় জৈন ভিক্ষুরা রাস্তা ঝাড়ু দিতে দিতে অগ্রসর হয়। তারা অত্যন্ত মিহি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবও নাক-মুখে ঢুকে মারা না যায়।

অহিংসা সম্পর্কে এত চরমপন্থী হওয়ায় জৈনদের পক্ষে কৃষিজীবী হওয়া সম্ভব ছিলনা। কৃষিকাজের জন্য কীটপতঙ্গ মারতে এবং আগাছা ধ্বংস করতে হয়। ফলে সব কিছুরই প্রাণ আছে এ বিশ্বাসে একজন জৈনর পক্ষে কৃষক হওয়া এবং কঠোরভাবে অহিংসা পালন করা কঠিন। প্রাণী হত্যার ভয়ে জৈনরা ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে না। জৈন ধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সে নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং সে সাথে জড়িত আর্থিক লেনদেন জৈনদের একমাত্র পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

জৈন ধর্মের অনুশাসনগুলো প্রথমে মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর জৈন সন্ন্যাসী স্থূলভদ্রের আহ্বানে পাটলিপুত্রে অনুষ্ঠিত জৈন মহাসভায় ১২টি অনুশাসন লিপিবদ্ধ করা হয় যার নাম দ্বাদশ অঙ্গ। পরে খ্রিস্টিয় ৫ম শতাব্দীতে কাথিয়াওয়াড়ের বলভীতে অনুষ্ঠিত মহাসভায় আরো ১২টি অনুশাসন যোগ করা হয় যা দ্বাদশ উপাঙ্গ রূপে পরিচিত। পুঁথি নকল করাকে জৈন সন্ন্যাসীরা পুণ্যকর্ম মনে করতেন। ফলে পশ্চিম ভারতের প্রাচীন জৈন বিহারগুলো অসংখ্য দুস্প্রাপ্য জৈন ও অজৈন পুঁথির ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। মধ্য যুগে জৈন সন্ন্যাসীরা প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু টীকা ভাষ্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় কবি নয়চন্দ্র ছিলেন একজন জৈন সন্ন্যাসী। কালিদাসের টীকাকার হিসাবে বিখ্যাত মল্লিনাথও ছিলেন জৈন।

প্রথম দুই শতাব্দী ধরে জৈনরা সংখ্যায় ছিল নিতান্তই অল্প এবং জৈন ধর্ম পূর্ব ভারতে মগধ, কোশল, বিদেহ এবং অঙ্গ রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করে জৈন ভিক্ষু হয়েছিলেন। ফলে তখন জৈন ধর্মের বেশ প্রসার ঘটে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে উত্তর ভারতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনেক জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে চলে যান। তিনি মহাবীরের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলার এবং জৈনদের নগ্ন থাকার পক্ষপাতি ছিলেন। ফলে তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা দিগম্বর নামে পরিচিত হন। উত্তর ভারত থেকে যাওয়া জৈনদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র এবং তিনি তাঁর অনুসারীদের শ্বেতবস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দেন এবং এ জন্য তারা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হন। দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়লেও তাদের মধ্যে কোনো মৌলিক মতভেদ নেই এবং দিগম্বরপন্থী জৈনরাও বস্ত্র পরিধান করে।

মৌর্য এবং গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্বে উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত জৈনরা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে জৈন ধর্ম প্রধানত দুটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পশ্চিমে কাথিয়াওয়ার, গুজরাট এবং রাজস্থানের কিছু অংশে শ্বেতাম্বর জৈনরা প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্য, মহীশুর এবং হায়দ্রাবাদে দিগম্বরদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে জৈন ধর্ম কখনও ভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করেনি। বা ভারতেও বৌদ্ধধর্মের মত ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি। জৈনধর্ম ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং আজও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তবে বৌদ্ধ ধর্মের মত জৈনধর্ম কখনও ভারতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মত হুমকিরও সম্মুখীন হয়নি।

সারসংক্ষেপ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভারতেও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এক প্রচন্ড আলোড়ন দেখা দেয়। ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা এবং মুক্তির উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও শিক্ষা নিয়ে এ সময় ভারতে প্রধানত দুটি ধর্মের উদ্ভব হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জৈন ধর্ম। মূখ্যত, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ এসব নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটে। জৈন ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে বর্ধমান মহাবীরের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জৈন কিংবদন্তী অনুসারে ২৪ জন তীর্থঙ্কর এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন বর্ধমান মহাবীর। অন্যান্য তীর্থঙ্করদের মধ্যে পার্শ্বনাথ ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন বেনারসের রাজা অশ্বসেনের পুত্র। মহাবীরের প্রায় ২৫০ বছর আগে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর প্রধান চারটি শিক্ষা ছিল– (১) প্রাণী হত্যা না করা, (২) মিথ্যা কথা না বলা, (৩) চুরি না করা এবং (৪) সম্পত্তির অধিকারী না হওয়া। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এ সঙ্গে সংসারী না হওয়ার শিক্ষা যুক্ত করেন। মহাবীর আনুমানিক ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশালীর নিকটবর্তী কুন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং ত্রয়োদশ বছরে সত্যজ্ঞান লাভ করে কেবলিন (সর্বজ্ঞ), জিন (জয়ী) এবং মহাবীর আখ্যা লাভ করেন। প্রায় ৩০ বছর তাঁর ধর্মমত প্রচারের পর ৭২ বছর বয়সে পাবা নামক গ্রামে অনশনে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। জৈন ধর্মে অহিংসা ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জৈনরা কর্মফলে বিশ্বাসী। গত জীবনের কর্মফল থেকে মুক্তিলাভের তিনটি উপায় (ত্রিরত্ন) হল– সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান, সৎ আচরণ। রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে জৈন ধর্মের বেশ প্রসার ঘটে। পরবর্তী সময়ে জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর– এ দুটি ভাগে বিভক্ত হলেও তাদের মধ্যে কোন মৌলিক মতভেদ নেই। জৈন ধর্ম ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং আজও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জৈন ধর্মের প্রবর্তকরূপে পরিচিত–

(ক) পার্শ্বনাথ (খ) ঋষভ

(গ) মহাবীর (ঘ) গোশাল

২। মহাবীর ছিলেন–

(ক) শূদ্র (খ) বৈশ্য

(গ) ব্রাহ্মণ (ঘ) ক্ষত্রিয়

৩। মহাবীরের জন্মস্থান–

(ক) পাটলিপুত্র (খ) কুন্দপুর

(গ) বৈশালী (ঘ) পুন্ড্রনগর

৪। মহাবীর প্রাণত্যাগ করেন–

(ক) শ্রাবণবেলগোলা (খ) পাবা

(গ) উজ্জয়িনী (ঘ) কুশিনগর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সংক্ষেপে বৈদিক ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা হারাবার কারণ নির্ণয় করুন।

২। বর্ধমান মহাবীর সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। জৈন ধর্মে অহিংসা নীতি কঠোরভাবে পালনীয়– ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. জৈনধর্মের উদ্ভবের কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২. বর্ধমান মহাবীরের জীবনী ও শিক্ষাবলী আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People,* Vol-1.

২। *Encyclopedia of Religion and Ethics.*

৩। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ৪

বৌদ্ধ ধর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি–

- বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও শিক্ষাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গৌতম বুদ্ধ

সমসাময়িক ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। জাতক গ্রন্থগুলো, সিংহলি ইতিবৃত্তগুলো এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতে লেখা ললিতবিস্তার এ বিষয়ে আমাদের কিছুটা তথ্য সরবরাহ করে।

গৌতম বুদ্ধের পূর্বনাম ছিল সিদ্ধার্থ। গৌতম গোত্রজাত বলে তিনি গৌতম নামে পরিচিত। ভারতের উত্তর প্রদেশের এবং বিহারের উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রামে শাক্যবংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এখন প্রায় সব পন্ডিতই মনে করেন যে, গৌতম বুদ্ধ ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা শুদ্ধধন ছিলেন শাক্য জাতির গোষ্ঠী নেতা। তাঁর মাতার নাম মায়া দেবী। বাল্যকালে গৌতম অস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই শিক্ষালাভ করেছিলেন। ষোল বছর বয়সে গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ২৯ বছর বয়সে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তখন গৌতম সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে প্রথমে তিনি আলারাকালাম নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে ধ্যান ও তপস্যাবিদ্যা অর্জন করেন। কিছুদিন পর তিনি পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছয় বছর কঠোর ধ্যান ও কৃচ্ছ্রসাধন করেন এবং এ পথে মুক্তি লাভ করা যাবেনা বুঝতে পেরে তা ত্যাগ করেন। এবার তিনি উরুবিল্ব নামক স্থানে এক পিপল গাছের নিচে সাধনা করতে থাকেন। ৪৯ দিন সাধনার পর তিনি দিব্যজ্ঞান বা বোধি লাভ করে বুদ্ধ (জ্ঞানী) বলে পরিচিত হন।

বারাণসীর কাছে সারনাথে গৌতম বুদ্ধ তাঁর ভূতপূর্ব পাঁচ সঙ্গীর কাছে প্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এই ঘটনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' রূপে আখ্যায়িত। এরপর তিনি বরাণসী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বুদ্ধের ধর্মমত প্রধানত মগধে প্রচারিত হলেও উত্তর প্রদেশের কোশল দেশেই তাঁর ধর্মের বিকাশ ঘটে। গৌতম বুদ্ধ প্রায় ২১ বছর কোশল দেশে তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কোশল রাজা প্রসেনজিৎ তাঁর ভক্ত ছিলেন। প্রসেনজিৎ -এর রাণী মল্লিকাও ছিলেন গৌতম বুদ্ধের শিষ্যা। বারাণসী ও রাজগৃহ থেকে তিনি নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন এবং তাঁর পিতা, স্ত্রী ও পুত্রকে তাঁর ধর্মমতে দীক্ষিত করেন। জীবনের ৪৫ বছর তিনি অক্লান্তভাবে ধর্মপ্রচার করেন এবং এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তাঁর ধর্মগ্রহণ করেন। ৮০ বছর বয়সে গোরখপুর জেলার কুশিনগরে ৪৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক থেকে বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে জানা যায়। ত্রিপিটক বলতে বুঝায় বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক, এবং অভিধম্ম পিটক। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠ-জীবন সম্পর্কিত বিধান হচ্ছে বিনয়

পিটকের বিষয়বস্তু। সুত্ত পিটকে বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক দিক এবং অভিধম্ম পিটকে বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক দিক আলোচিত হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি

বৌদ্ধ ধর্ম মূলত: দুঃখবাদী। গৌতম বুদ্ধের ধর্মের মূল লক্ষ ছিল মানুষকে দু:খের হাত থেকে রক্ষা করা। বুদ্ধ মনে করতেন যে মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা আবার নতুন দেহে জন্মলাভ করে এবং পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে। কর্ম থেকে আসে আসক্তি ও বাসনা এবং তার থেকে আসে দুঃখ। তাঁর মতে জন্মগ্রহণ করাটাই দুঃখের। কাজেই পুনর্জন্মকে রোধ করা সম্ভব হলে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে; মানুষের আত্মা নির্বাণ লাভ করবে। কর্মফল ও তার পরিণাম দুঃখ সম্পর্কে বুদ্ধ আর্যসত্য নামে পরিচিত চারটি সত্য উপলব্ধি করেন। এগুলো হচ্ছে (১) মানুষের জীবনে দুঃখ আছে এবং জন্মই দু:খের কারণ; (২) কামনা, বাসনা, অতৃপ্তি প্রভৃতি হচ্ছে দুঃখের কারণ; (৩) এই কামনা, বাসনা , অতৃপ্তি রোধের উপায় আছে; এবং (৪) দুঃখ নিরোধের জন্য সঠিক মার্গ বা পথ অনুসরণ করতে হবে। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধ আটটি পথ বা মার্গের (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে: সৎ বর্ণ , সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা, সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা, সৎ চেতনা, সৎ সংকল্প এবং সৎ দর্শন।

গৌতম বুদ্ধ মধ্যপন্থা অনুসরণ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অত্যধিক ভোগ-বিলাস বা অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন না করে মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করাকেই তিনি মধ্যপন্থা বলে অভিহিত করেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে একজন মানুষ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি এবং নির্বাণ লাভ করতে পারে। নির্বাণ হচ্ছে পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। নির্বাণ লাভ করলে মানুষকে আর দু:খ ভোগ করতে হবে না। স্বর্গ বা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলন বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ নয়। গৌতম বুদ্ধ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেও নীরব ছিলেন। বৌদ্ধরা হিন্দু ও জৈনদের মত কর্মফল ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। জৈনদের মত বৌদ্ধরাও অহিংসবাদী। তারা বেদের পবিত্রতা এবং বৈদিক যাগ-যজ্ঞের ফলপ্রসূতাকে স্বীকার করে না।

জাতি বা বর্ণ নিয়ে গৌতম বুদ্ধের কোন মাথাব্যথা ছিলনা। যে কোন পেশা, ধর্ম বা বর্ণের মানুষই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে পারতো। জৈন ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্মও বিপুল সংখ্যায় সমাজের নিপীড়িত মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। বৈশ্যদের অর্থ ও বিত্ত থাকলেও তেমন সামাজিক মর্যাদা ছিলনা। শূদ্রদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। ফলে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে তারা এ নতুন ধর্মে যোগ দিয়েছিল। অধ্যাপক রোমিলা থাপার বলেছেন যে, সম্প্রতিকালেও ধর্মান্তরের এ প্রক্রিয়া চলছে। ভারতের আদমশুমারি রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি বলেছেন যে, ১৯৫১ সালে ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৪৮৭ জন। দশ বছর পরে তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩,২৫০,২২৭ জনে। এর মধ্যে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষের ওপরে। সাধারণত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে হরিজনদের মধ্যেই এ ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা ছিল বেশি।

গৌতম বুদ্ধ মধ্যপন্থী হওয়ায় তিনি তাঁর শিষ্যদের মঠে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন।মঠগুলো সন্ন্যাসীদের শুধু আবাসনস্থলই ছিলনা।কালক্রমে এগুলো বিদ্যাচর্চার বড় বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসংগে বিক্রমশিল, সোমপুর এবং নালান্দা মঠের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একসঙ্গে মঠে থাকার এবং সেখানে উপাসনা করার নিয়ম থাকায় ভারতের প্রাচীনতম এ স্থাপত্য থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর তাঁর বাণীগুলোকে নিয়ে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রথম মতভেদ দেখা দিয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতবিভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মিরে। কোন কোন সূত্র মতে এটা হয়েছিল জলান্ধরে। এতে সভাপতি ছিলেন বসুমিত্র এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অশ্বঘোষ। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের অর্থ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার পর আলোচনার সারাংশ বিভাষ-শাস্ত্ররূপে সংকলিত হয়। এ সময়ই বৌদ্ধদের মধ্যে গুরুতর মতবিরোধের সূত্রপাত হয় এবং মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ঘটে। আগে বৌদ্ধরা ছিল হীনযানপন্থী।

মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা বোধিসত্ত্বের ধারণার প্রচলন করে। বোধিসত্ত্ব অর্থ যারা বুদ্ধত্ব লাভ না করলেও সে পথে অগ্রসর হচ্ছেন। হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের মতে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন এক সর্বজ্ঞ পুরুষ, শিক্ষক ও সংস্কারক। মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের মতে তিনি ছিলেন দেবতা। হীনযানপন্থী বৌদ্ধরা ব্যক্তির মুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্য দিকে মহাযানপন্থায় সমষ্টির মুক্তির চিন্তা করা হয়। মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে তাঁর পূজা শুরু করে। হীনযানপন্থী বৌদ্ধরা অষ্টমার্গের সাধনাকেই মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করে। হীনযানপন্থী বৌদ্ধরা নৈতিক আচরণ ও সৎ কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন; মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা বিভিন্ন বোধিসত্ত্বের আরাধনার ওপর গুরুত্ব দিতেন। হীনযানপন্থী বৌদ্ধরা ব্যবহার করেছিলেন পালি ভাষা, মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা ব্যবহার করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা। কণিষ্কের সভাসদ নাগার্জুন ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রবক্তা। অশোকের আমলে হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরে শ্রীলংকা এবং মায়ানমারে বিস্তার লাভ করেছিল। কণিষ্কের আমলে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম মধ্য এশিয়া, চীন ও তিব্বতে প্রসার লাভ করে।

বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তার কারণ

ভারতের এক কোণে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হলেও কালক্রমে এ ধর্ম সমস্ড় ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে শ্রীলংকা, মায়ানমার, তিব্বত, জাভা, সুমাত্রা, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড ও মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সংখ্যার বিবেচনায় বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম।

প্রাচীন ভারতে এ ধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভের বহু কারণ ছিল।বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাবলী ছিল সহজ-সরল।এ ধর্মে কোন জটিল দার্শনিকতত্ত্ব নেই এবং এ ধর্ম পালন করতে পুরোহিত বা অর্থেরও প্রয়োজন হয় না।ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যয়বহুল জটিল অনুষ্ঠানাদি নিয়ে ক্লান্ত সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্মকে স্বাগত জানিয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাবলীই যে শুধু সহজ-সরল ছিল তাই নয়– এগুলো প্রচারিত হয়েছিল জনগণের পরিচিত ও সহজবোধ্য পালি ভাষায়। গৌতম বুদ্ধ নিজেও তাঁর ভক্তদের কাছে পালি ভাষায় ধর্মের বাণী প্রচার করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এটা বিরক্তিকর বৈদিক সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথা ছিল না। বহু বর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজে সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলনা। ব্রাহ্মণরা সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলে তা অন্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্ষত্রিয়রা শাসন ও দেশরক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতো। বৈশ্যরা ছিল বিত্তশালী। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা ছিল প্রচুর অর্থের অধিকারী। কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা না থাকায় এ দুই বর্ণের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।শূদ্রদের অবস্থা ছিল নিতান্তই করুণ। কাজেই বর্ণহীন বৌদ্ধ সমাজে সকলেরই সমান সুযোগ-সুবিধা থাকায় সবাই এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

হিন্দু ধর্মের পূজা-অর্চনা এবং যাগ-যজ্ঞ ছিল জটিল ও ব্যয়বহুল। পূজা ও যজ্ঞে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো, যা ছিল সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম পালন করতে অর্থের প্রয়োজন হতো না। অর্থ ব্যয় না করেও একজন মানুষ ধার্মিক বা সৎ জীবন-যাপন করতে পারতো। সংযমী জীবন-যাপনের মাধ্যমে মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারতো এবং এজন্য কোন পুরোহিতেরও প্রয়োজন হতো না। কাজেই সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধ ধর্ম সহজেই আকর্ষণ করেছিল। তা ছাড়া পশুবলির প্রতি সাধারণ মানুষ ছিল বীতশ্রদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মে পশুবলি না থাকায় জনসাধারণ এ ধর্মের প্রতি উৎসাহী হয়ে পড়ে।

গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিত্বও বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। বর্ষাকালের চার মাস ছাড়া গৌতম বুদ্ধ সারা বছরই বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করতেন। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের

অধিকারী ও সুবক্তা গৌতম বুদ্ধ তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে বৌদ্ধ সংঘেরও বিরাট অবদান ছিল। ধর্ম প্রচারে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীরা সমন্বিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ধর্ম প্রচারই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁরা ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকতো। সংসার বা অর্থ সম্পর্কে তাদের কোন চিন্তা না থাকায় তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ করতে পারত। তা ছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সহজ-সরল ও সৎ জীবন যাত্রাও অনেককে মুগ্ধ করে; এ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। বৌদ্ধবিহারগুলো ক্রমে হয়ে ওঠে শিক্ষাকেন্দ্র এবং জ্ঞান-পিপাসু বহু ব্যক্তি এসব বিহারে জ্ঞানচর্চার জন্য আসত। সে কালে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নালন্দা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল।চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এ শিক্ষাকেন্দ্রে পাঁচ বছর জ্ঞানচর্চা করেছিলেন।অধ্যাপক রোমিলা থাপার বলেছেন যে, বৌদ্ধ বিহারগুলো শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছিল।সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষই ভিক্ষুনী বা ভিক্ষু হতে পারত বলে শিক্ষা শুধুমাত্র সমাজের উঁচু শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও জনপ্রিয়তা লাভের একটি কারণ। অশোক, কণিষ্ক ও হর্ষবর্ধনের মত শক্তিশালী রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

শুরুতে বৌদ্ধ ধর্মের তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম ছিলনা । তখনও খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামের উদ্ভব হয়নি। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুপস্থিতি বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সহায়ক হয়েছিল।

বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার ক্ষমতাও বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্যের একটি কারণ। গৌতম বুদ্ধ নিজেই ছোটখাটো বিধানগুলোর ব্যাপারে বৌদ্ধ সংঘগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন।ফলে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন বৌদ্ধ ধর্মে আনা হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব থেকেই এটা প্রমাণিত হয়।একজন বৌদ্ধ কেবলমাত্র বুদ্ধে বিশ্বাসী হতে পারত না বহু বোধিসত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতো। মূর্তি পূজারী হয়ে বা মাংসভক্ষণকারী হয়েও সে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হতে পারত। এ সমস্ত কারণে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ

বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রচলিত থাকলেও ভারতে এ ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বর্তমানে অত্যন্ত কম।ভারতে এ ধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার বা অবনতির অনেকগুলো কারণ ছিল।

বৌদ্ধ সংঘের দুর্বলতা এ ধর্মের অবনতির জন্য দায়ী ছিল। কালক্রমে সংঘগুলো ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। বৌদ্ধ বিহারগুলোতে অবস্থানকারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে।

পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং পরধর্মসহিষ্ণু হলেও তাঁরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে বৌদ্ধধর্ম কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলই রাজপুত রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তাঁরা ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসার বাণী তাদের মনে কোন সাড়া জাগায়নি। তারা মনে করতেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়ের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস নীতিই দায়ী ছিল। এজন্য তারা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে উত্তর ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে একই কারণে দক্ষিণ ভারতেও বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ঘটে।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধরা মহাযান ও হীনযান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কালক্রমে এরা আরও অনেক উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়লে বৌদ্ধদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে জনগণ এ ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

বৌদ্ধসংঘে ভিক্ষুণীদের প্রবেশাধিকার ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। কিন্তু এটা বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় সংঘের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা ছিল প্রশ্নাতীত।কিন্তু ক্রমে সংঘগুলোতে দুর্নীতি প্রবেশ করে।ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের চিরকৌমার্য পালন করার বিধি থাকলেও তারা সংসার জীবন-যাপন করতে শুরু করে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এ ধর্মের আকর্ষণ কমে যায়।

হিন্দু ধর্মের আত্মীকরণ শক্তিও বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির অন্যতম কারণ।হিন্দুরা গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজা করতে শুরু করে। গৌতম বুদ্ধের মূর্তিপূজা, মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের পার্থক্য কমে আসে। মহাযান শাস্ত্রগুলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলে হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে এগুলোর মিলনের পথ রচিত হয়। হিন্দুধর্ম সংস্কারকরা বৌদ্ধ দেব-দেবীকে হিন্দু দেব-দেবীর বিকল্প বলে প্রচার করেন। বৌদ্ধ তারাকে দেবী দুর্গার অবতার হিসাবে কল্পনা করা হয়। সেন যুগের কবি জয়দেব গৌতম বুদ্ধকে কৃষ্ণের অবতাররূপে বর্ণনা করেন। হিন্দু ধর্ম গুরু ও পন্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের শাখা হিসাবে গণ্য করলে বৌদ্ধ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য বেড়ে যায়। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের মধ্যে নীতিবোধ ও তপস্যার চেয়ে তান্ত্রিক ও অলৌকিক শক্তি প্রকাশের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। দেব-দেবী ও বোধিসত্ত্বের পূজা এবং উচ্চারণ প্রাধান্য লাভ করে এবং অষ্টমার্গের সাধনার গুরুত্ব লোপ পায়। ফলে জনমনে বৌদ্ধ ধর্মের আবেদনও লোপ পায়।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমানদের অত্যাচারকে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। তাঁরা হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারেরও অভিযোগ করেছেন।কিন্তু হিন্দু ধর্মতো আজও টিকে আছে।প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বৌদ্ধধর্মকে ক্ষয়িষ্ণু করে ফেলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মকে আত্মীভূত করে ফেলে।

বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি প্রায় একই সময়ে এবং পাশাপাশি অঞ্চলে ঘটেছিল। এ দুটি ধর্মের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় ঃ

উভয় ধর্মের প্রবর্তকই ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত।

উভয় ধর্মেরই জন্ম হয়েছিল হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধর্মরূপে। হিন্দু ধর্মের যাগ-যজ্ঞ এবং আড়ম্বরপূর্ণ পূজা সম্পর্কে হতাশাবোধ থেকে এ দুটি ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল।

এ দুটি ধর্মের কোনটিই বেদকে ঐশ্বরিক গ্রন্থরূপে এবং ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে না।

উভয় ধর্মই দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে ভক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

উভয় ধর্মই অহিংসবাদী। প্রাণী হত্যা উভয়ের কাছেই মহাপাপ বলে বিবেচিত।

দুটি ধর্মই শ্রেণীভেদ প্রথার বিরোধী। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষেরই এ দুটি ধর্মে যোগদানের অধিকার ছিল।

হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করলেও উভয় ধর্মেই হিন্দু ধর্মের কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায়। যেমন উভয় ধর্মই কর্মফল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী।

কর্মফল ও পুনর্জন্মের দু:খ থেকে মুক্তি লাভই হচ্ছে উভয় ধর্মের লক্ষ।

উভয় ধর্মই জনগণের ভাষা অর্থাৎ পালি ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল।

উভয় ধর্মেই মঠ-জীবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দুটি ধর্মের কোনটিই প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেনা।অবশ্য জৈন ধর্ম সরাসরি ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেও বৌদ্ধ ধর্ম এ ব্যাপারে নীরব।

উভয় ধর্মই প্রধানত বৈশ্য, শূদ্রদের আকর্ষণ করেছিল।

উভয় ধর্মই প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বৌদ্ধরা মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। জৈনরা বিভক্ত দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে।

সমসাময়িক এ দুটি ধর্মের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু বৈশাদৃশ্যও দেখা যায় ঃ

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল ২৪ জন তীর্থঙ্করের মাধ্যমে - এর প্রবর্তক সম্পর্কে কিছু জানা যায় না । মহাবীরকে জৈন ধর্মের প্রবর্তকরূপে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এ ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনরা নগ্ন থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এ ধরনের কোন রীতি নেই।

উভয় ধর্মই অহিংসবাদী হলেও জীবহত্যার ব্যাপারে জৈনরা চরমপন্থী। কোন ভাবেই যেন জীবহত্যা না হয় সে ব্যাপারে জৈনরা অত্যন্ত সতর্ক।

জৈন ধর্ম কখনই ভারতের বাইরে প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আজও টিকে আছে। অন্যদিকে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্তপ্রায় হলেও জৈন ধর্ম কোনও দিনই ভারতে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয় নি।

জৈন ধর্মে আত্মার চিন্তা অত্যন্ত ব্যাপক। তারা জড় পদার্থের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জৈনদের এই সর্বপ্রাণবাদে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে না ।

জৈনরা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতি।কিন্তু গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের মধ্যপথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জৈন ধর্মে মুক্তির উপায় হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধন, তপস্যা ও উপবাসে প্রাণত্যাগ। বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণ লাভের উপায় হচ্ছে অষ্টমার্গ অনুসরণ করা।

সারসংক্ষেপ

সমসাময়িক ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।তিনি ৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রামে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ। ২৯ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। উরুবিল্ব নামক স্থানে একটি পিপল গাছের নিচে ৪৯ দিন সাধনার পর তিনি দিব্যজ্ঞান বা বোধি লাভ করে বুদ্ধ বলে পরিচিত হন।সারনাথে তিনি প্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪৫ বছর অক্লান্তভাবে ধর্মপ্রচার করেন। অত:পর ৮০ বছর বয়সে গোরখপুর জেলার কুশিনগরে ৪৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ধর্মের মূল লক্ষ ছিল মানুষকে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা।দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি আটটি পথ বা মার্গের কথা বলেছেন। তিনি মধ্যপন্থা অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংসবাদ, সহজ-সরল শিক্ষাবলী সহজেই সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। কেননা, হিন্দু ধর্মের ব্যয়বহুল, জটিল পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞ এবং জাতিভেদ প্রথা সাধারণ মানুষকে ক্লান্ত-অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল।সম্রাট অশোকের সময়কালে গুরুতর মতপার্থক্যের দরুন বৌদ্ধরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েপড়ে– হীনযান ও মহাযানপন্থী। ভারতের এক কোণে উদ্ভব হলেও কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম সমস্ত ভারত এবং উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে শ্রীলংকা, চীন, মায়ানমার, তিব্বত, জাভা, সুমাত্রা, জাপান, থাইল্যান্ড ও মধ্যএশিয়ায় প্রসার লাভ করে। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে জনমনে এ ধর্মের আবেদন কমে যায়। তা সত্ত্বেও, সংখ্যার বিবেচনায় এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান–

(ক) কপিলাবস্তু (খ) লুম্বিনী

(গ) সারনাথ (ঘ) নালন্দা।

২। 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলতে বুঝায়–

(ক) বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মের বাণী প্রচার শুরু

(খ) বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মের চাকা বন্ধ করে দেওয়া

(গ) বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠা

(ঘ) বুদ্ধের ধর্মযাত্রা।

৩। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের আর্যসত্যের মধ্যে নেই কোনটি?

(ক) জন্মই দুঃখের কারণ (খ) কামনা, বাসনা দুঃখের কারণ

(গ) কামনা, বাসনা অতৃপ্তির রোধের উপায় আছে

(ঘ) সন্ন্যাস জীবনই দুঃখ থেকে মুক্তির পথ।

৪। বিহার বৌদ্ধদের–

(ক) উপাসনালয় মাত্র (খ) ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(গ) রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র (ঘ) সামাজিক মিলনায়তন।

৫। কোন দেশটিতে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেনি–

(ক) থাইল্যান্ড (খ) শ্রীলংকা

(গ) জাভা (ঘ) ইরান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে নির্বাণ লাভের উপায় কি?

২। হীনযান ও মহাযান সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৩। সংক্ষেপে বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। গৌতম বুদ্ধের জীবনী উল্লেখপূর্বক তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলনীতি ব্যাখ্যা করুন।

২। বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তার কারণসমূহ সহ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People,* Vol-1

২। *Encyclopedia of Religion and Ethics.*

৩। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১ম খন্ড।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (গ) ; ২। (খ) ; ৩। (খ) ; ৪। (গ)।

পাঠ : ২ ১। (খ) ; ২। (গ) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (গ) ; ৫। (ক) ; ৬। (গ) ; ৭। (খ) ; ৮। (গ) ; ৯। (ঘ)।

পাঠ : ৩ ১। (গ) ; ২। (ঘ) ; ৩। (খ) ; ৪। (খ)।

পাঠ : ৪ ১। (খ) ; ২। (ক) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (খ) ; ৫। (ঘ)।